শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবৃন্দা-তুলসীমহিমামৃত

তারক ব্রহ্ম দাস

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবৃন্দা-তুলসীমহিমামৃত

আন্তর্জাতিককৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্ত্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী

প্রভুপাদের অনুকম্পিত

বিশ্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাণীর প্রচারকবর
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মাহারাজের অনুগৃহীত-

তারক ব্রহ্ম দাস কর্তৃক

সংগৃহীত ও

সম্পাদিত

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

প্রকাশক ঃ
মনোরম কৃষ্ণ দাস
শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির,
শ্রীধাম মায়াপুর,
নদীয়া।

প্রথম সংস্করণ ঃ ২০০০ কপি
৫২০ তম শ্রীশ্রীগৌর জন্ম-জয়ন্তী
শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির, শ্রীধাম মায়াপুর,
নদীয়া, পিন ঃ ৭৪১৩১৩

মুদ্রক ঃ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেস এণ্ড ডি.টি.পি. সেন্টার, বল্লালদিঘী, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
ফোন ঃ ২৪৫৫১০, ৯৯৩২৩৬৩১৮৪

ভিক্ষা ঃ ৩০ টাকা মাত্র

ওঁ বৃন্দায়ৈ নমঃ

সম্পাদকের নিবেদন

শ্রীশ্রীবৃন্দা-তুলসী মহিমামৃত সার সম্পুট-গ্রন্থের প্রধান বিষয় বস্তু শ্রীশ্রীবৃন্দা-তুলসী দেবীর অত্যুত্তম মহিমা প্রকাশ। বৃন্দা-তুলসীদেবী বৈদিক মানব সমাজের কল্যাণ চিন্তার দিব্যাতিদিব্য অমৃতের সন্ধান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কাছে বৃন্দা-তুলসীদেবী জ্যোতির্ময় চিৎ জগতে ভাবাদর্শের সন্ধান প্রদান করে। গৌড়ীয় সাধক শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা সম্পদ লাভের জন্য নিষ্ঠা, দৈন্য, উৎকণ্ঠা ও লালাসাময় সেবাভিলাষ প্রার্থনা করে থাকেন বৃন্দা-তুলসীদেবীর কাছে যা আমরা দীন কৃষ্ণদাস বিরচিত "নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী-" ইত্যাদি তুলসী আরতি কীর্তনের মাধ্যমে অনুভব করতে পারি।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবী হলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর কৃপা হলে বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্য সেবার অধিকার লাভ হয়। অভিরাম লীলামৃতে বলা হয়েছে —

"বৃন্দা কৃপা হৈলে হয় বৃন্দাবন প্রাপ্তি।
প্রেম সেবা প্রপ্তি হয় বৃন্দাবনে স্থিতি।।"

তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর চরণে প্রার্থনা করে থাকেন —

" বৃন্দাদেবী কবে মোরে বান্ধিয়া করুণা ডোরে,
আকর্ষিয়া লবে ব্রজপুরে।"

অতএব, শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা অভিলাষীর কাছে শ্রীবৃন্দাদেবীর কৃপা প্রাপ্তি অপরিহার্য।

শ্রীমতী তুলসীদেবী হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী। শাস্ত্রে তুলসী দেবীকে শ্রীবৃন্দাদেবীর এক প্রকাশ বিগ্রহ বলা হয়েছে। গৌড়ীয় আচার্যবর্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর "শ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকে" ৭ম শ্লোকে বলেছেন—

প্রকাশক ঃ
মনোরম কৃষ্ণ দাস
শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির,
শ্রীধাম মায়াপুর,
নদীয়া।

প্রথম সংস্করণ ঃ ২০০০ কপি
৫২০ তম শ্রীশ্রীগৌর জন্ম-জয়ন্তী
শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির, শ্রীধাম মায়াপুর,
নদীয়া, পিন ঃ ৭৪১৩১৩

মুদ্রক ঃ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেস এণ্ড ডি.টি.পি. সেন্টার, বল্লালদিঘি, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
ফোন ঃ ২৪৫৫১০, ৯৯৩২৩৬৩১৮৪

ভিক্ষা ঃ ৩০ টাকা মাত্র

ওঁ বৃন্দায়ৈ নমঃ

সম্পাদকের নিবেদন

শ্রীশ্রীবৃন্দা-তুলসী মহিমামৃত সহ সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রধান বিষয় বস্তু শ্রীশ্রীবৃন্দা-তুলসী দেবীর অত্যুজ্জ্বল মহিমা প্রকাশ। বৃন্দা-তুলসীদেবী বৈদিক মানব সমাজের কল্যাণ চিন্তার নিরবচ্ছিন্ন অমৃতের সন্ধান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কাছে বৃন্দা-তুলসীদেবী জ্যোতির্ময় চিং জগতে ভাবরাজ্যের সন্ধান প্রদান করে। গৌড়ীয় সাধক শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা সম্পদ লাভের জন্য নিষ্ঠা, দৈন্য, উৎকণ্ঠা ও নানাসময় সেবাভিলাষ প্রার্থনা করে থাকেন বৃন্দা-তুলসীদেবীর কাছে। আমরা দীন কৃষ্ণদাস বিরচিত "নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী" ইত্যাদি তুলসী আরতি কীর্তনের মাধ্যমে অনুভব করতে পারি।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবী হলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর কৃপা হলে বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্য সেবার অধিকার লাভ হয়। অভিরাম লীলামৃতে বলা হয়েছে—

"বৃন্দা কৃপা হৈলে হয় বৃন্দাবন প্রাপ্তি।
প্রেম সেবা প্রাপ্তি হয় বৃন্দাবনে স্থিতি।।"

তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর চরণে প্রার্থনা করে থাকেন—

"বৃন্দাদেবী কবে মোরে বান্ধিয়া করুণা ডোরে,
আকর্ষিয়া লবে ব্রজপুরে।"

অতএব, শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা অভিলাষীর কাছে শ্রীবৃন্দাদেবীর কৃপা প্রাপ্তি অপরিহার্য।

শ্রীমতী তুলসীদেবী হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী। শাস্ত্রে তুলসী দেবীকে শ্রীবৃন্দাদেবীর এক প্রকাশ বিগ্রহ বলা হয়েছে। গৌড়ীয় আচার্যবর্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর "শ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকে" ৭ম শ্লোকে বলেছেন—

"তবৈব মূর্তিস্তুলসী নৃলোকে
বৃন্দে! নুমস্তে চরণার বিন্দম্।।"

অর্থাৎ হে শ্রীমতী বৃন্দাদেবী! এই নরলোকে সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ রূপিনী তুলসী দেবী হলেন তোমারই মূর্তি। তোমার চরণারবিন্দে প্রণাম করি। আলোচ্য উক্তি থেকে অবগত হতে পারি যে, শ্রীবৃন্দাদেবীর এক বিশেষ স্বরূপ হলেন তুলসী মহারাণী। উভয় স্বরূপের শরণাগত হলেই বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা লাভ হয়।

গৌড়ীয় আচার্যশ্রেষ্ঠ শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" গ্রন্থের পূর্ব বিভাগে চৌষট্টি প্রকার সাধন ভক্ত্যাঙ্গের আলোচনা প্রসঙ্গে ২০৩ নং শ্লোকে বলেছেন —"অথ তদীয়ানাং সেবনং তুলস্যা।"— অর্থাৎ তদীয় গণের সেবার মধ্যে তুলসী সেবা অগ্রগণ্য। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন —

"তদীয়' তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত।।"
চৈ. চ. মধ্য— ২২/৭১

সাধারণ অর্থে "তদীয়" অর্থ হলো "তার"। কিন্তু এখানে "তদীয়" অর্থ ব্যাপক ও গভীর। এখানে শ্রীভগবান আপনার বলে যাঁদের অঙ্গীকার করেছেন তাঁদেরকেই নির্দেশ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বস্তু তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবতের যথাযোগ্য ভাবে সেবা করাই তদীয় বস্তুর সেবা। তাই উক্ত চারি বস্তুই তদীয় পদবাচ্য। এই চারি বস্তুর মধ্যে তুলসীদেবী হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া। তুলসী ব্যতীত কোন ভোগ্যবস্তুই শ্রীভগবান গ্রহণ করেন না। তাই বৈষ্ণব পদকর্তা গেয়েছেন—"ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন, বিনা তুলসী প্রভু একো নাহি মানি।।"—

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন— "আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে।"— চৈতন্য চরিতামৃত। শ্রীমদ্ভাগতে (৩/১৫/৪৩) বলা হয়েছে- কমল নয়ন শ্রীভগবানের চরণ কমলের কেশর মিশ্রিত তুলসীর সুগন্ধ যুক্ত বায়ু নাসিকা দ্বারা অন্তঃকরণে প্রবেশ করে ব্রহ্মানন্দ সেবী সনকাদিরও চিত্তে হর্ষাদি সঞ্চারী ভাবের ও

দেহে রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়েছিল। চরণ তুলসীর সুগন্ধেই তাঁরা অন্তঃকরণে নির্মল আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। তাই বলা হয় যে, ভগবানের চরণ তুলসীর গন্ধে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ব্যক্তিরও চিত্ত হরণ করে থাকে। চরণ তুলসীর এমনই মহিমা। তাই শ্রীবৃন্দা- তুলসী দেবীর সেবা শ্রীকৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে এক বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

আরাধ্য বস্তুর জন্য যিনি উৎকণ্ঠিত তিনিই এই গ্রন্থের আদর করবেন, অন্যের কাছে ততটা প্রয়োজনীয় নাও হতে পারে। যে ব্যক্তি গ্রীষ্মের তপন তাপে তাপিত হয়ে পিপাসার্ত তার নিকটই অতিসুশীতল জল উপাদেয় ও সুখপ্রদ বলে মনে হয়। কিন্তু যার আদৌ কোন পিপাসাই নেই তার কাছে উপাদেয় তো বহু দূরের কথা জলের প্রয়োজনীয়তা বোধই তার নেই। সেরূপ আরাধ্য বস্তুর নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত সাধক যে রূপ প্রয়োজন বোধ করেন যার আদৌ কোন ব্যাকুলতা নেই বা অভাব বোধ নেই আরাধ্য বস্তু মাধুর্যের কোন অনুভবও তার নেই। ভক্ত সাধক কি ভাবে তার আরাধ্য বস্তুর জন্য ব্যাকুলিত হয়ে সেবা সম্পদ লাভ করে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবেন— তারই ভাবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে আলোচ্য "শ্রীশ্রীবৃন্দা- তুলসী মহিমামৃত" গ্রন্থে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রেরিত হয়ে অত্র গ্রন্থ মুদ্রণের বিষয়ে যার ঐকান্তিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার অনাবিল সম্পর্ক বিদ্যমান সেই উদার চরিত মদীয় গুরুভ্রাতা শ্রীপাদ দিব্য গোপাল দাস ব্রহ্মচারী গ্রন্থ মুদ্রণের আনুকূল্য প্রদান করেছেন। শ্রী শ্রীরাধামাধব, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীবৃন্দা-তুলসীদেবী তার পারমার্থিক মঙ্গল বিধান করুন। তিনি সুদীর্ঘ ভজন জীবন লাভ করে নিত্য- সেবায় নিয়োজিত থাকুন।

শ্রীধাম মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের সজ্জন ভক্তবৃন্দের উৎসাহে, আগ্রহাতিশয্যে, সহানুভূতিতে এবং তাদের কৃপাদেশ শিরোধার্য করে অত্র গ্রন্থ সম্পাদনের কার্যে ব্রতী হয়েছি। আমি নিতান্তই ভজনহীন, অজ্ঞ, অযোগ্য, অভাজন। সাধন বা ভজনানুভব আমার কিছুই নেই। তবুও মহদাজ্ঞা পালনের জন্য তাদের চরণরেণু স্মরণ করে গ্রন্থ

সম্পাদনের কার্যে হস্তক্ষেপ করেছি। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষদুষ্ট মদীয় প্রুফ সংশোধনের অজ্ঞতা বশতঃ মুদ্রিত গ্রন্থে যে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে অদোষদর্শী ভক্ত পাঠকগণ নিজগুণে তা সংশোধন করতঃ গ্রন্থ আস্বাদন করলে কৃতার্থ হব। সর্বশেষে, সমস্ত ভক্তগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা এই যে, শ্রীনামাশ্রয়ে থেকে নিজাভীষ্ট ভজনে যাতে নিযুক্ত থাকতে পারি, তজ্জন্য মায়াবিড়ম্বিত এই জীবাধমের প্রতি অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করুন।

ইত্যলম্—

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাসাভাষ

তারক ব্রহ্ম দাস।

ওঁ বৃন্দায়ৈ নমঃ

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীবৃন্দা তুলসী মহিমামৃত গ্রন্থখানি এমনই এক ভক্তির ভাণ্ডার, যে এটি না অধ্যায়ণ করলে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমরা কলিহত জীব, আমাদের মন ও চেতনা কলিদ্বারা কলুষিত। এই কলির কলুষকে নাশ করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই ভুমণ্ডলে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনি এই জগতে হরিনাম এবং তুলসী সেবা রূপ অস্ত্র দিয়ে সমস্ত কলুষ নাশ করেন। নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও মাতা তুলসী মহারাণী সেবা ও পূজা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমরা বৃন্দা-তুলসী দেবী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানার জন্য তার সেবা করতে অবহেলা করি। তার কারণ হচ্ছে আমরা তুলসী দেবী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে অবগত নই। এইরূপ কোন প্রামাণিক গ্রন্থও পাওয়া যায় না। শ্রীপাদ তারক ব্রহ্ম প্রভু দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে এই ভক্তির ভাণ্ডার রূপ শ্রীশ্রীবৃন্দা ও তুলসী মহিমামৃত নামক গ্রন্থটি সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তদের সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বাদি জানতে সাহায্য করবে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীপাদ তারক ব্রহ্ম প্রভুর কাছে ঋণী যে তিনি আমাকে নগন্য জেনেও এই প্রকাশনার সেবাটি প্রদান করেছেন। পরিশেষে, আশা করি কলিযুগ পাবন অবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাই এবং নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় সকলে এই গ্রন্থটি অধ্যায়ান করে দিব্য আনন্দ লাভ করতে পারবেন।

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দের কাছে আমার বিনম্র প্রার্থনা যে, এই গ্রন্থে যদি কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহা আপনারা নিজগুণে সংশোধন করিয়া আস্বাদন করুন।

ইতি—

মনরম কৃষ্ণ দাস

প্রকাশক

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ৫২০ তম আবির্ভাব
মহাসমারোহ স্মৃতি প্রকাশন।
"শ্রীশ্রীবৃন্দা-তুলসী-মহিমামৃত"

।। উৎসর্গ পত্রম্।।

শ্রীগ্রন্থ রচনা কালে যাঁর অমৃত দৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হৃদয়ে উদিত হয়েছে,
সেই বিশ্ববরেণ্য আচার্য ও কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারক বর
চিদ্বিলাস প্রবিষ্ট পরমারাধ্যতম মদীয় পরম
গুরুপাদপদ্ম ভুবন পাবন
পরমহংস কুলতিলক
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের
শ্রীকরকমল যুগলে
শ্রীশ্রীবৃন্দা - তুলসী মহিমামৃত"
নামক গ্রন্থ সাদরে উৎসর্গীকৃত হলে।

।। হরেকৃষ্ণ।।

শ্রী শ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়ত!

।। শ্রীবৃন্দাখন্ড।।

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

।।২।। শ্রীতুলসী খন্ড।।

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

——০০——

—ঃ সহায়ক গ্রন্থ সমূহ ঃ—

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ — শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

২। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ— শ্রীল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

৩। শ্রীপদ্ম পুরাণ— শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

৪। শ্রীগরুড় পুরাণ— শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

৫। শ্রীস্কন্দ পুরাণ— শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

৬। শ্রীবৃহৎ ধর্ম পুরাণ— শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

৭। শ্রীহরিভক্তিবিলাস— শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী।

৮। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু— শ্রীল রূপ গোস্বামী।

৯। শ্রীউৎকলিকা বল্লরী— শ্রীল রূপ গোস্বামী।

১০। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত — শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।

১১। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত — শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

১২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

সূচীপত্র

১৩। শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত — শ্রীনন্দকিশোর দাস।

১৪। শ্রীঅভিরাম-লীলামৃত— শ্রীতিলক রাম দাস।

১৫। শ্রীগৌরগোবিন্দ লীলামৃত — শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ।

১৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত— শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর।

১৭। শ্রীভক্তিরত্নাকর— শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী।

১৮। শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা— শ্রীল রূপ গোস্বামী।

১৯। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা— শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী।

২০। শ্রীমাধবমহোৎসব— শ্রীল জীব গোস্বামী।

২১। শ্রীভক্তি সন্দর্ভ— শ্রীল জীব গোস্বামী।

২২। শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ— শ্রীঈশান নাগর।

২৩। শ্রীবৈষ্ণব পদাবলী— শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

২৪। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনী — শ্রীহরিদাস দাস সম্পাদিত।

২৫। শ্রীসাধনামৃত চন্দ্রিকা— শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী সম্পাদিত।

২৬। শ্রীগর্গ সংহিতা — শ্রীমন্মহর্ষি গর্গাচার্য্য।

২৭। শ্রীস্তবামৃত লহরী— শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

২৮। শ্রীস্তবাবলী— শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

২৯। শ্রীমন্ত্রার্থ কৌস্তুভ — শ্রীমদনমোহন দাস ব্যাকরণতীর্থ।

৩০। শ্রীভক্তামৃতলহরী— শ্রীকিশোরী দাস।

— ০ —

"বৃন্দা কৃপা হৈলে হয় বৃন্দাবন প্রাপ্তি।
প্রেমসেবা প্রাপ্তি হয় বৃন্দাবনে স্থিতি।।"
—অভিরাম লীলামৃত।

দৈনন্দিন লীলা কৃষ্ণের বৃন্দাদেবী জানে।
কহিবে তোমারে তিহোঁ যাহ তিহোঁ স্থানে।।"
— শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃত।

শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের উপদেশ —

"গৃহাঙ্গনে শ্রীতুলসী করিবে স্থাপন।
তুলসী বিহনে গৃহ শ্মশানের সম।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ —

" প্রভু বোলে-মুঞি তুলসীরে না দেখিল।
ভাল নাহি বাসো যেন মৎস্য বিনে জলে।।
যবে চলে সংখ্যা নাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন।।
সংখ্যা নাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথায় থোয়েন তুলসীরে প্রভু পাশে।।
তুলসীরে দেখেন লয়েন সংখ্যা নাম।
এ ভক্তি যোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন।।"

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

শ্রীচৈতন্য মনোঽভিষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুক্ত পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণ চৈতন্য দেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ ললিতা- শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।

রাসাভিলাষো বসতিশ্চ বৃন্দাবনে ত্বদীশাঙ্ঘ্রি- সরোজ- সেবা।
লভ্যা চ পুংসাং কৃপয়া তবৈব বৃন্দে নুমস্তে চরণার বিন্দম্।।

বৃন্দায়ৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।
তুলসী কাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণ-পঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।।
যাঁহাকে দেখিলে সর্বপাপ শান্ত হয়।
পরশ করিলে বপু পবিত্র করয়।।
বন্দনা করিলে সব রোগ যায় নাশ।
সেচন করিলে কাল পায় মহাত্রাস।।
রোপণ করিলে কৃষ্ণে করান আসক্তি।
চরণে অর্পণ কৈলে দেন প্রেমভক্তি।।
এমন যে শ্রীতুলসী তাঁকে নমস্কার।
দন্তে তৃণ ধরি মুঞি করোঁ বার বার।।

— ০ —

শ্রীশ্রী বৃন্দা-তুলসী মহিমামৃত

ওঁ বৃন্দাদেব্যৈ নমঃ।

।। শ্রীবৃন্দা খণ্ড ।।

প্রথম স্তবক

ক) শ্রীবৃন্দাদেবীর তত্ত্বঃ—

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামাধুরী আস্বাদন ভক্ত প্রাণের নিত্য সম্পদ। বৃন্দাবনে বাস বা শ্রীযুগলের সেবা লাভে শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর কৃপার অপেক্ষা রয়েছে। তাই বৃন্দাদেবীর তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রথম পাদে কেদার নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর কন্যা বৃন্দাদেবী, তিনি যে বনে তপস্যা করতেন সে বনের নাম বৃন্দাবন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকায় বলা হয়েছে যে,- শ্রীকৃষ্ণ লীলায় চন্দ্রভানুর কন্যারূপে বৃন্দাদেবী আবির্ভূতা হন। বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণের দূতী, কুঞ্জাদি সংস্কারে অভিজ্ঞা, বৃক্ষ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পন্ডিতা। শ্রীযুগলের মিলন সম্পাদনই বৃন্দার কাজ। শ্রীযুগলের সমস্ত লীলারই পারিচালিকা বৃন্দাদেবী।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর কৃপায় শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা লাভ করা যায়। তিলক রাম দাস বিরচিত ''শ্রীঅভিরাম লীলামৃত'' গ্রন্থে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের উক্তিঃ—

''বৃন্দা কৃপা হৈলে হয় বৃন্দাবন প্রাপ্তি। প্রেমসেবা প্রাপ্তি হয় বৃন্দাবনে স্থিতি।।''— -গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও ''শ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকে'' বলেছেন— ''বসতীশ্চ বৃন্দাবনে তদীশাঙ্ঘ্রি-সরোজ সেবা।''- অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাদেবীর কৃপায় বৃন্দাবনে বাস করে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা লাভ হয়। বৃন্দাদেবী শ্রীযুগলের কুঞ্জ সেবার প্রধান সহায়। ''বৃন্দাদেব্যষ্টকে'' বলা হয়েছে-''ত্বং কীর্ত্তসে সাত্বত- তন্ত্রবিদ্ভি লীলা বিধানা কিল কৃষ্ণ শক্তিঃ। অর্থাৎ হে বৃন্দে! সাত্বত তন্ত্রাদি শাস্ত্র সমূহে তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা শক্তি বলা হয়েছে।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে পশু- পাখী সকলেই শ্রীবৃন্দাদেবীর আদেশ পালন করেন। "শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে" নবম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—

"বৃন্দার সেবিত সেই হয় বৃন্দাবন।
বৃন্দা আজ্ঞাকারী আদি পশু-পাখীগণ।।
শুক- শারী কোকিলাদি ময়ূর ময়ূরী।
রাধা কৃষ্ণ লীলা দেখি বুলে নৃত্য করি।।"—

'বৃন্দাদেব্যষ্টকে" বলা হয়েছে—

"ত্বয়াজ্ঞয়া পল্লব পুষ্প ভৃঙ্গ
মৃগাদিভি মাধব- কেলি কুঞ্জা ঃ।"-

অর্থাৎ বৃন্দাদেবীর আজ্ঞাক্রমেই বৃন্দাবনে পত্র, পুষ্প, ফল, ভ্রমর, মৃগ, ময়ূর, শুক-শারী ইত্যাদি পশু- পাখী গণ ও চির বসন্ত শ্রীকৃষ্ণের কেলিকুঞ্জে পরম রমনীয় শোভা ধারণ করে।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলায় শ্রীখণ্ডে মুকুন্দ দাস রূপে আবির্ভূত হন এ সম্পর্কে গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামীর উক্তিঃ— "ব্রজাধিকারিনী যাসীদ্বৃন্দাদেবী তু নামতঃ। সা শ্রী মুকুন্দ দাসোঽদ্য খন্ড বাস ঃ প্রভু প্রিয়।।" অর্থাৎ—

"ব্রজাধিকারিনী শ্রীবৃন্দাদেবী নাম।
যোগমায়ার প্রিয় দাসী কৃষ্ণ সেবা ধাম।।
ঘটনা ঘটন রঙ্গ করে অনুক্ষণ।
যাহার ইঙ্গিতে নাচে শ্রীবংশীবদন।।
বনদেবী বলি যাঁর অপূর্ব আখ্যাতি।
নিকুঞ্জ সাজায়া সদা প্রেমানন্দে মাতি।।
যুগল কিশোর তার বশ অনুক্ষণ।
শ্রীমতীর মন তুষ্টি করে সর্বক্ষণ।।

এই বৃন্দাদেবী এবে কৈল আগমন।
শ্রীমুকুন্দ দাস নামে দিল দরশন।।
অচিন্ত্য অগম্য মুকুন্দ দাসের মহিমা।
গৌরাঙ্গের শুদ্ধ দাস এই তার সীমা।।"
—ভক্তামৃত লহরী।

অন্য এক স্বরূপে শ্রীমতী বৃন্দাদেবী অভিরাম শক্তি শ্রীমতী মালিনী দেবী রূপে আবির্ভূতা হন।

"শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে" ৭ম পরিচ্ছেদে—

"দিবা গোষ্ঠে চ গোপাল ঃ কামিনী রাস মন্ডলে।
ব্রজে বৃন্দা সমজ্ঞাতা ইদানীং মালিনী স্মৃতা।।"
অর্থাৎ-"দিবসে গোপাল ভাবে গোষ্ঠেতে গমন।
রাসেতে কামিনী রূপ কররে ধারণ।।
সেই বৃন্দাদেবী এবে পূর্ব অনুরাগে।
অবতীর্ণ ধরা মাঝে মালিনী নামেতে।।"—

শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর মাধুর্যময়ী তত্ত্ব এভাবে বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

(খ) শ্রীবৃন্দার পরিচয়; চরিত্র ও সেবার নির্ণয় ঃ—

গৌড়ীয় আচার্য্য শ্রেষ্ঠ শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকায়" শ্রীবৃন্দাদেবীর পরিচয় প্রদান করেছেন।

"তপ্তকাঞ্চন বর্নাভা বৃন্দা কান্তির্মনোহরা।
নীলবস্ত্র পরিধানা মুক্তা- পুষ্পবিরাজিতা।।
চন্দ্রভানুঃ পিতা তস্যাঃ ফুল্লরা জননী তথা।
পতিরস্যা মহীপালো মঞ্জরী ভগিনী চস্য।।
বৃন্দাবন সদাবাসা নানা কেলী রসোৎসুকা।

উভয়োমিলনাকাঙ্খী তয়োঃ প্রেম পরিপ্লুতা।।"

অনুবাদঃ— শ্রীমতী বৃন্দাদবীর দেহকান্তি মনোহর ও তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়; নীল বসন পরিধানে, মুক্তা এবং পুষ্প দ্বারা বিভূষিতা। এঁর পিতার নাম চন্দ্রভানু, জননীর নাম ফুল্লরা, পতির নাম মহীপাল,ভাগিনীর নাম মঞ্জরী। শ্রী বৃন্দাদেবী শ্রীধাম বৃন্দাবনে সদাই বাস করেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নানাবিধ লীলার দূতী এবং লীলা রসে সর্বদাই সমুৎস্যুক,উভয়ের মিলন কার্যে প্রেমে পরিপূর্ণা থাকেন এই বৃন্দাদেবী।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর পরিচয় সম্বন্ধে অভিরাম লীলামৃতে বলা হয়েছে— (১০ ম পরিচ্ছেদে)

"বীরা- বৃন্দা- বংশী এই হয় তিন দূতী।
বীরা ব্রজে থাকে বৃন্দা অতি শুদ্ধমতী।।
দূতীর প্রধান সেই বৃন্দা ঠাকুরাণী।
কৃষ্ণ প্রিয়গণের সে সুপ্রিয় বাদিণী।।
ব্রজের মোহিণী বরা হয় বৃন্দাবতী।
শ্রীমতী রাধার সঙ্গে সতত বসতী।।
যৈছে রাধা তৈছে বৃন্দা একই স্বরূপ।
তথাপি সে বৃন্দাবতী হয় রসকূপ।।
বৃন্দাবতী জানে সব রসের সন্ধান।
জানিয়া শুনিয়া করে রস মূর্তিমান।।
ষটকোণ সম্মুখ কোনে রহেন সদাই।
শ্রী রূপ মঞ্জরী আদি মিলেন তথাই।।
চুরাশি ক্রোশ বৃন্দাবন চিদানন্দ ময়।
তারপর ষোল ক্রোশ পরাৎপর হয়।।
তারপর অষ্টক্রোশ তাঁহার নির্ণয়।
তার মধ্যে চারিক্রোশ গোবর্দ্ধন হয়।।

তারমধ্যে রত্নবেদী হয় সিংহাসন।
আটতপ হয় তার অতি বিচক্ষণ।।
রত্নে ভূষিত স্থান দেখিতে মাধুরী।
তথা সদা লীলা করে কিশোর কিশোরী।।
সেই রত্নবেদী উপর রহে গোপীগণ।
সবাই করেন রাধা কৃষ্ণের সেবন।।
রাধা কৃষ্ণসুখ সবে বাঞ্ছেন সদাই।
প্রাণ পোষ্টা সখী বৃন্দা বলিহারী যাই।।
সিদ্ধমন্ত্র বৃন্দাকে দিল পৌর্ণমাসী।
মন্ত্র বলে বনদেবীগণ তার দাসী।।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর মাধুরী ও অবস্থান সম্পর্কে "অভিরাম লীলামতে" ২০ শ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—

"বৃন্দার রূপ গুণ সেই কহনে না যায়।
রাধা কৃষ্ণলীলা সব পোষক করায়।।
বৃন্দা কৃপা হৈলে হয় বৃন্দাবন প্রাপ্তি।
প্রেম সেবা প্রাপ্তি, হয় সখী সঙ্গে স্থিতি।।
বৃন্দার সেবিত সেই বৃন্দাবন পুরী।
কুঞ্জে কুঞ্জে করে লীলা কিশোর কিশোরী।।
বৃন্দাবতী দ্বারী তথা থাকেন সদাই।
অপূর্ব প্রসঙ্গ সেই বলিহারী যাই।।
শুন শুন বেদ গর্ভকহি যে নির্ধারি।
ষট্ কোণ সম্মুখ কোণে বৃন্দা যে দ্বারী।।
"শ্রীশ্রীগোপালচম্পুতে" প্রমাণ রয়েছে। যথা—
"বৃন্দাবতী গৌরবর্ণা চিত্রবস্ত্র সুশোভিতা।
স্বর্ণভূষা পুষ্পমালা বিভূতি মোহিনী বরা।।

উভয়োমিলনাকাঙ্খী তয়োঃ প্রেম পরিপ্লুতা।।”

অনুবাদঃ— শ্রীমতী বৃন্দাদবীর দেহকান্তি মনোহর ও তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়; নীল বসন পরিধানে, মুক্তা এবং পুষ্প দ্বারা বিভূষিতা। এঁর পিতার নাম চন্দ্রভানু, জননীর নাম ফুল্লরা, পতির নাম মহীপাল,ভাগিনীর নাম মঞ্জরী। শ্রী বৃন্দাদেবী শ্রীধাম বৃন্দাবনে সদাই বাস করেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নানাবিধ লীলার দূতী এবং লীলা রসে সর্বদাই সমুৎসুক,উভয়ের মিলন কার্যে প্রেমে পরিপূর্ণা থাকেন এই বৃন্দাদেবী।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর পরিচয় সম্বন্ধে অভিরাম লীলামৃতে বলা হয়েছে— (১০ম পরিচ্ছেদে)

“বীরা- বৃন্দা- বংশী এই হয় তিন দূতী।
বীরা ব্রজে থাকে বৃন্দা অতি শুদ্ধমতী।।
দূতীর প্রধান সেই বৃন্দা ঠাকুরাণী।
কৃষ্ণ প্রিয়গণের সে সুপ্রিয় বাদিণী।।
ব্রজের মোহিণী বরা হয় বৃন্দাবতী।
শ্রীমতী রাধার সঙ্গে সতত বসতী।।
যৈছে রাধা তৈছে বৃন্দা একই স্বরূপ।
তথাপি সে বৃন্দাবতী হয় রসকূপ।।
বৃন্দাবতী জানে সব রসের সন্ধান।
জানিয়া শুনিয়া করে রস মূর্তিমান।।
ষটকোণ সম্মুখ কোনে রহেন সদাই।
শ্রী রূপ মঞ্জরী আদি মিলেন তথাই।।
চুরাশি ক্রোশ বৃন্দাবন চিদানন্দ ময়।
তারপর ষোল ক্রোশ পরাৎপর হয়।।
তারপর অষ্টক্রোশ তাঁহার নির্ণয়।
তার মধ্যে চারিক্রোশ গোবর্দ্ধন হয়।।

তারমধ্যে রত্নবেদী হয় সিংহাসন।
আটতপ হয় তার অতি বিচক্ষণ।।
রত্নে ভূষিত স্থান দেখিতে মাধুরী।
তথা সদা লীলা করে কিশোর কিশোরী।।
সেই রত্নবেদী উপর রহে গোপীগণ।
সবাই করেন রাধা কৃষ্ণের সেবন।।
রাধা কৃষ্ণসুখ সবে বাঞ্ছেন সদাই।
প্রাণ পোষ্টা সখী বৃন্দা বলিহারী যাই।।
সিদ্ধমন্ত্র বৃন্দাকে দিল পৌর্ণমাসী।
মন্ত্র বলে বনদেবীগণ তার দাসী।।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর মাধুরী ও অবস্থান সম্পর্কে “অভিরাম লীলামতে” ২০ শ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—

“বৃন্দার রূপ গুণ সেই কহনে না যায়।
রাধা কৃষ্ণলীলা সব পোষক করায়।।
বৃন্দা কৃপা হৈলে হয় বৃন্দাবন প্রাপ্তি।
প্রেম সেবা প্রাপ্তি, হয় সখী সঙ্গে স্থিতি।।
বৃন্দার সেবিত সেই বৃন্দাবন পুরী।
কুঞ্জে কুঞ্জে করে লীলা কিশোর কিশোরী।।
বৃন্দাবতী দ্বারী তথা থাকেন সদাই।
অপূর্ব প্রসঙ্গ সেই বলিহারী যাই।।
শুন শুন বেদ গর্ভকহি যে নির্ধারি।
ষট্ কোণ সন্মুখ কোণে বৃন্দা যে দ্বারী।।
“শ্রীশ্রীগোপালচম্পুতে” প্রমাণ রয়েছে। যথা—
“বৃন্দাবতী গৌরবর্ণা চিত্রবস্ত্র সুশোভিতা।
স্বর্ণভূষা পুষ্পমালা বিভূতি মোহিনী বরা।।

ষট্ কোণ সন্মুখ কোণে শ্রীবৃন্দাবতী চ রূপিনী।
দিব্যরূপা ধরাসিদ্ধা শ্রীবৃন্দাবনাধিশ্বরী।।"

অনুবাদঃ— বৃন্দাবতী গৌরবর্ণা দেখিতে উজ্জ্বল।
চিত্র বস্ত্র পরিধান করে ঝলমল।।
স্বর্ণ ভূষা পুষ্পমালা অঙ্গেতে ভূষণ।
বিভূতি মোহিনী বরা দেখি হরে মন।।
ষট কোণ সন্মুখ কোণে বৃন্দা যে রূপিনী।
বৃন্দাবন অধিশ্বরী হয় সোহাগিনী।।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর যুথের সাথে যুক্ত আরও ছয়টি যুথ রয়েছে। "নারদ কারিকার" বলা হয়েছে—

"কৌশল্যা কামিনী ধন্যা কুমুদী রাগমল্লিকা।
শরকাদ্যা ষড়েতাশ্চ যুথপর্ব নিগদ্যতে।।"—
অনুবাদঃ— "কৌশল্যা কামিনী ধন্যা রহে সেই যুথে।
কুমুদী রাগমল্লিকা শারকাদ্য সাথে।।
এই ছয় যুথ রহে বৃন্দাবতী সনে।
রাধা কৃষ্ণলীলা সেই করিলা পোষণে।।

অতএব কহি এবে তার মনোবৃত্তি।
চতুর পন্ডিতা সেই হয় বৃন্দাবতী।।
রসিক হইলে জানে রসের সন্ধান।
সদাই করেন বৃন্দা রস মূর্তিমান।।
....
সে মর্ম জানিয়া তবে বৃন্দা ঠাকুরাণী।
কৃষ্ণ প্রিয়গণের সে সুপ্রিয় বাদিনী।।"—

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর চরিত্র মাধুরী ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় যা রাধাকৃষ্ণ লীলার পোষণ করে।

দ্বিতীয় স্তবক

।। কেদার রাজের কন্যারূপে যজ্ঞকুণ্ড থেকে শ্রীবৃন্দা দেবীর আবির্ভাব।।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর আবির্ভাব সম্পর্কে শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে "শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খন্ডে" ষড়শীতিতম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের কাছে নন্দ মহারাজ কেদার কন্যা বৃন্দার বিস্তৃত বিবরণ জানতে চাইলে বৃন্দার আবির্ভাব সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে পিতঃ ! সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার স্বায়ম্ভুব নামে এক পুত্র হয়। সায়ম্ভুবের স্ত্রীর নাম শতরূপা। সায়ম্ভুর-শতরূপার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র হয়। উত্তান পাদের পুত্র ধ্রুব। ধ্রুব মহারাজের পুত্র নন্দ সার্বণি, তাঁর পুত্র কেদার রাজ।

এই মহা যশস্বী কেদার রাজ পরম বিষ্ণুভক্ত ও সপ্তদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁকে রক্ষা করার জন্য সুদর্শন চক্র তাঁর রাজ সভায় অবস্থান করত। স্বয়ং বরুণ দেব কেদার রাজকে নয় লক্ষ গাভী, লক্ষ সুবর্ণ, সর্ব শস্যাবৃত্ত উত্তম ভূমি, লক্ষ অশ্ব, লক্ষ হস্তী, উত্তম মণি- মুক্তা- হীরক ইত্যাদি যাবতীয় উত্তম বস্তু প্রদান করেছিলেন। কেদার রাজ প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ পাত্রে পান- ভোজনাদি প্রদান করতেন এবং ঐ সঙ্গে স্বর্ণ নির্মিত যজ্ঞ সূত্র ও উত্তম অঙ্গুরীয়, রত্ন নির্মিত আসন প্রদান করতেন। অন্যান্য জন সাধারণকে প্রার্থনা অনুযায়ী তাদের অভিলাষ পূর্ণ করতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকাল হতে আরম্ভ করে সন্ধ্যা কাল পর্যন্ত ভোজন ও ধনাদি দান চলত। ফলমূল ভোজী জিতেন্দ্রিয় ও বিষ্ণুভক্ত রাজা কেদার সব কিছুই ভগবানে সমর্পণ করে দিবারাত্র কেবল ভগবানেরই নাম জপ করতেন।

বিষ্ণুভক্ত কেদার রাজ এক সময় ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। সেই যজ্ঞ হতে—

"কমলা কলয়া জাতা যজ্ঞ কুণ্ড সমুদ্ভবা।

বহ্নিশুদ্ধাং শুকধানা রত্ন ভূষণ ভূষিতা।।"

বঙ্গার্থঃ— কেদার রাজের যজ্ঞকুণ্ড থেকে কমলা লক্ষ্মীর অংশে জাতা এক বহ্নি শুদ্ধ বস্ত্র পরিহিতা রত্ন ভূষণ সমূহে বিভূষিতা এক কন্যা আবির্ভূতা হন। সেই কন্যা আবির্ভূতা হয়ে কেদার রাজকে বললেন,— হে মহারাজ! যজ্ঞ কুণ্ড থেকে আবির্ভূতা আমি আপনার কন্যা। রাজা কেদার সেই কন্যাকে পূজা করে পত্নীকে প্রদান করলেন এবং সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। সেই কন্যা পিতা মাতাকে বিনয় সহকারে ভক্তি করে তাদের অনুমতি নিয়ে তপস্যা করার জন্য যমুনা নদীর তীরবর্তী এক রমণীয় পুণ্য বনে গমন করলেন। কেদার রাজের এই কন্যার নাম বৃন্দা। যেহেতু তাঁর তপস্যার বন, সেই হেতু যমুনা তীরবর্তী ঐ বনের নাম "বৃন্দাবন"। কেদার কন্যা বৃন্দা ঐ বনে বহু কাল যাবৎ তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। এক সময় ব্রহ্মা তার তপস্যা য় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর তপস্যার স্থান বৃন্দাবনে আগমন করেন। বৃন্দা বরণীয় ব্রহ্মার কাছে ভগবানকে পতি রূপে লাভ করার বর প্রর্থনা করলেন। ব্রহ্মা তখন বৃন্দাকে এই বর প্রদান করলেন যে,- তুমি শ্রীকৃষ্ণকে পতি রূপে লাভ করবে। তদনন্তর এক সময় সতী বৃন্দাদেবী রত্নাভরণে বিভূষিতা হয়ে বসন্তকালে যমুনা নদীর তীরে ঈষৎ হাস্য বদনে পুষ্প শয্যার শয়ন করে অবস্থান করছিলেন। এদিকে ব্রহ্মা সাধ্বী মনোহরা সেই বৃন্দাকে পরীক্ষা করার জন্য পরম মনোহর ধর্মকে তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। তখন বৃন্দা সেই নির্জন স্থানে চন্দন চর্চিত , রত্নে বিভূষিত এক অতি উত্তম যুবক পুরুষকে দর্শন করলেন। বৃন্দা তাকে দেখে ভক্তি সহকারে পূজা করে তাকে প্রণাম করলেন। তারপরে সুমিষ্ট ফলমূলাদি তাকে প্রদান করে ভোজন করালেন। বিপ্ররূপী ধর্ম আনন্দিত হয়ে বৃন্দার পূজা গ্রহণ করে কামুকী রমণী গণের অভিলষিত কিন্তু সতী সাধ্বী রমণী গণের অসহনীয় বাক্য বলতে আরম্ভ করলেন।

ধর্ম বলতে লাগলেন,— হে মনোহরে! তোমার নাম কি? কার কন্যা তুমি? এই নির্জন বনে তুমি কি কর? তোমার অভিলাষ কি? তোমর মনোবাঞ্ছিত বর আমার নিকট প্রার্থনা কর।" বৃন্দা বললেন,— "হে ব্রাহ্মণ! আমি কেদার রাজ কন্যা বৃন্দা। এই নির্জন বনে আমি শ্রীহরিকে লাভ করার জন্য তপস্যা করছি। 'শ্রীহরি আমার পতি হোন"— এই বাঞ্ছিত বর প্রদানে যদি আপনি সমর্থ হন তবে আমাকে বর প্রদান করুন। আর যদি অসমর্থ হন তবে অন্যপ্রশ্ন না করে স্বস্থানে গমন করুন। বিপ্ররূপী ধর্ম বললেন যিনি ভক্তগণকে অনুগ্রহ করার জন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী ব্যতীত অন্য কোন্ রমণী তাঁকে পতি রূপে লাভ করতে সমর্থ হবে? যিনি দ্বিভুজ কিশোর সেই শ্রীহরি বংশীবদন কৃষ্ণ রাধাপতি গোলোকে অবস্থান করেন। ব্রহ্মা সেই কৃষ্ণকে জন্মে জন্মে ভজনা করেও যথার্থ রূপে জ্ঞাত হতে পারেনি। মৃত্যুঞ্জয় শিব পঞ্চবদনে যাঁর স্তব করেও জানতে পারেননি, সেখানে অন্য কে তাঁকে জানতে পারবে? দেবী দুর্গা, বসুন্ধরা, গজানন, ষড়ানন, মুনিগণও তাঁকে ভজনা করে জানতে পারেন নি। কল্যানী! তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণকে পতি রূপে লাভ করতে বাসনা করছ? শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র রাধিকারই লভ্য, অন্য কারও কদাচ লভ্য নহেন।

হে সুবদনে! আমি দেবগণ ও দৈত্যগণ হতেও অধিক বলশালী এবং নৃপগণের ঈশ্বর। অতএব, তুমি আমাকে পতিরূপে বরণ কর। ত্রিলোক মধ্যে যতকিছু বস্তু আছে, সেই সমস্ত সুখকর বস্তু আমার করুণায় উপভোগ করতে পারবে। তুমি আমার সাথে অতি রমণীয় স্থানে গমন করে বিহার কর, তোমর কল্যাণ হবে। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহারাজের কাছে বর্ণনা করলেন। বিপ্ররূপী ধর্ম বৃন্দাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে কি সংঘটিত হলো সে সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজকে বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ —

"ইতোবমুক্ত্বা সম্ভোক্তুং গচ্ছন্তং ত্বং ছলেন চ।
ন বাস্তবং পরীক্ষার্থং সতীত্বং বোধিতুং ব্রজ।।"

শ্রীভগবান বললেন— হে পিতঃ ব্রজরাজ! এরূপ কথা বলে সেই বিপ্ররূপী ধর্ম বাস্তবে নহে, কেদার কন্যা বৃন্দার সতীত্ব বোঝার জন্য এবং তাকে পরীক্ষা করার জন্য ছল করে বৃন্দাকে সম্ভোগ করতে উদ্যত হলেন। এরূপ অবস্থা দেখে বৃন্দার বদন ও নয়ন ক্রোধে রক্তবর্ণ হলো, বিপ্ররূপী ধর্মকে লোক হিতকর ও যোগযুক্ত বাক্য বললেন—

শ্রীবৃন্দোবাচ —

ধৈর্য্যং কুরু মহাভাগ শ্রেষ্ঠ জাতিষু ব্রাহ্মণঃ।
ব্রাহ্মণানাং তপোমূলং সত্যং বেদো ব্রতং ধৃতিঃ।।
পরস্ত্রী সহ সম্ভোগঃ স্বভাবশ্চাপ্য ধর্মিনাম্।
পতি ব্রতানাং গমনে বলৎকারেন নিশ্চিতম্।।
মাতৃগামী ভবেৎ সদ্যো ব্রহ্মহত্যাশতং ভবেৎ।
কুম্ভীপাকে পচ্যতে চ যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।।
তাড়িতো যমদূতশ্চৈ লৌহদণ্ডেন মুর্ধনি।
ক্ষণং সুখং চিরদুঃখং সর্বনাশস্য কারণম্।।

অনুবাদঃ— শ্রী বৃন্দা বললেন— হে মহাভাগ! আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন। আপনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তপস্যা, সত্য, ব্রত- এ সকলই ব্রাহ্মণের প্রকৃত ধর্ম। অধার্মিক পুরুষই পরস্ত্রী সম্ভোগ করে এবং পরে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বলপূর্বক পতিব্রতা স্ত্রীগমন করে, সে ব্যক্তি মাতৃগামী হয়, এবং শত ব্রহ্ম হত্যার পাপভাগী হয়। সে চন্দ্র ও সূর্য্যের অবস্থিতি কাল পর্যন্ত কুম্ভীপাক নরক যন্ত্রনা ভোগ করে। যমদূত গরম লৌহ দণ্ডের দ্বারা তার মস্তকে আঘাত করে। সুতরাং পতিব্রতা গমনে ক্ষণিক সুখ দান করে বটে, কিন্তু চিরকাল দুঃখ ও সর্বনাশের কারণ হয়ে থাকে।

তুমি নির্জন স্থান দেখে আমাকে বল- পূর্বক গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছ, কিন্তু হে ব্রাহ্মণ! এখানেই সমস্ত দেবগণ ও লোকপালগণ অবস্থান করছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আত্মারূপে, শিব জ্ঞান রূপে, দুর্গা বুদ্ধি রূপে, ব্রহ্মা মন রূপে, দেবগণ ইন্দ্রিয় বর্গ রূপে সকল প্রাণীতে সাক্ষী হয়ে বিরাজ করছেন। সুতরাং হে জ্ঞানহীণ ব্রাহ্মণ!—গুপ্ত স্থান বা নির্জন স্থান কোথায়? তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও স্বস্থানে গমন কর। তোমার কল্যাণ হোক। ব্রাহ্মণ অবধ্য, অন্যথায় আমি তোমাকে ভস্মসাৎ করতে সমর্থ। বৎস! তুমি যথাসুখে স্বস্থানে গমন কর। এভাবে বৃন্দাদেবী অনেক- নীতি পূর্ব উপদেশ প্রদান করে আরও গভীর সতর্ক বাণী প্রাদন করলেন।

শ্রীবৃন্দোবাচ —

"তপস্যাসু মম গতমষ্টোত্তর শতং যুগম্।
নাস্তি গোত্রং মৎপিতশ্চু ন মাতা ন পিতা মম।।
সর্বান্তরাত্মা ভগবান কৃষ্ণো রক্ষতি মাং দ্বিজ।
কৃষ্ণেন স্থাপিতো ধর্ম মাঞ্চ রক্ষতি নিত্যশঃ।।
আদিত্যশ্চ তথা চন্দ্রঃ পবনশ্চ হুতাশনঃ।
ব্রহ্মা শম্ভু ভগবতী দুর্গা রক্ষতি মাং সদা।
মাং মাতরং পরিত্যজ্য গচ্ছ বৎস যথাসুখম্।।

অনুবাদঃ— শ্রীবৃন্দা বললেন- এখানে তপস্যায় আমার অষ্টোত্তর শত (১০৮) যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে, আমার পিতার গোত্রের কোন ব্যক্তি নেই, আমার মাতা পিতাও বর্তমান নেই। হে দ্বিজ! সর্ব প্রাণীর অন্তরাত্মা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিরন্তর রক্ষা করেন। আর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্থাপিত ধর্মও আমাকে রক্ষা করছেন। চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, অগ্নি, ব্রহ্মা, শিব দুর্গা আমাকে নিরন্তর রক্ষা করছেন। অতএব বৎস! মাতৃরূপা আমাকে ত্যাগ করে তুমি যথাসুখে অন্যত্র গমন কর। তোমার মঙ্গল হোক।

শ্রীবৃন্দাদেবীর নীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করেও বিপ্ররূপী ছদ্ম বেশী ধর্ম অন্যত্র গমন করলেন না। বরং বৃন্দাকে গ্রহণ করার জন্য তাহার সন্নিকটে গমন করতে লাগলেন। তখন সেই বৃন্দাদেবী ক্রোধান্বিতা হয়ে বিপ্ররূপী ধর্মকে অভিশাপ দান করতঃ বললেন— "শশাপেতি চ সা কোপাদ্ ব্রহ্মবন্ধো ক্ষয়ভব। ক্ষয়ো ভব দুরাচার হে পাপিষ্ঠ ক্ষয়ো ভব।।"—

অনুবাদঃ— হে নীচাশয় ব্রাহ্মণ! তোমার ক্ষয় হোক। হে পাপিষ্ঠ! তোমার ক্ষয় হোক।— এ ভাবে "ক্ষয় হোক"- শাপবাণী তিনবার উচ্চারণ করলেন। পুণরায় শাপ দান করতে উদ্যতা হলে সূর্যদেব এসে তাকে নিবারণ করলেন। এ সময় ব্রহ্মা- বিষ্ণু- শিবাদি অন্যান্য দেবগণ আগমন করলেন। বৃন্দার শাপে ক্ষয় গ্রস্থ হয়ে অমাবস্যায়

ভীত চন্দ্রের ন্যায় কলারূপে (১৬ ভাগের ১ ভাগ) অতি কৃশ, দগ্ধ ও মলিন হয়ে বিপ্ররূপী ধর্ম নিশ্চেষ্ট হলেন। সেই সময়ে বিষ্ণু বললেন- হে জন্ম- মৃত্যু- জরাহরণ কারিণী বৃন্দে! তুমি আমার ভক্ত ধর্মকে জীবিত করে রক্ষা কর। ব্রহ্মা বললেন- হে বৃন্দে! ধর্ম ব্যতীত জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। চন্দ্র, সূর্য্য, অনন্ত ও বসুন্ধরা কম্পিত হচ্ছে। তুমি ধর্মকে রক্ষা কর। শিব বললেন- ধর্ম ছাড়া সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হবে। ধর্মকে তুমি রক্ষা কর। সূর্য্য বললেন- হে দেবি! তুমি ক্ষীণ ধর্মকে জীবিত করে সৃষ্টি রক্ষা কর। এভাবে ইন্দ্র, অনন্ত, বরুণ- পবন প্রভৃতি দেবতাগণ ধর্মকে জীবনদানের জন্য বৃন্দাকে অনুরোধ করলেন। দেবগণের এই প্রকার অনুরোধ শুনে পতিব্রতা তপস্বিনী বৃন্দা গাত্রোত্থান পূর্বক প্রণাম করে দেবগণকে বলতে লাগলেন।—

শ্রীবৃন্দাদেবী বললেন- হে দেবগণ। ধর্ম যে ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করে আমাকে পরীক্ষার জন্য এসেছে তা আমি জানতে পারি নাই। আমাকে গ্রহণ করতে উদ্যত হলে আমি কোপ বশতঃ তার ক্ষয় সাধন করেছি। আমি আপনাদের কৃপা প্রসাদে অবশ্যই ধর্মকে রক্ষা করব। এই কথা বলে বৃন্দাদেবী পুণরায় বলতে লাগলেন—

"তপঃ সত্যং যদি মম সত্যঞ্চ বিষ্ণুপূজনম্।
তেন পুণ্যেন সদ্যোঽত্র দ্বিজ ভবতু বিজ্বরঃ।।
যদি মেঽনশনং সত্যং ব্রত্যং সত্যং তপঃ শুচিঃ।
তেন পুণ্যেন সত্যেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ।।
যদি নারায়ণ ঃ সত্যোঃ সর্বাত্মা নিত্য বিগ্রহঃ।
জ্ঞানাত্মকঃ শিবঃ সত্যো দ্বিজ ভবতু বিজ্বরঃ।।"—

অনুবাদঃ— যদি আমার তপস্যা সত্য হয় এবং বিষ্ণু পূজন সত্য হয়, তবে সেই পুণ্যবলে এ স্থানে এই ব্রাহ্মণ রূপী ধর্ম পাপ জনিত ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় সন্তাপ মুক্ত হোন। যদি আমার অনশন- উপবাস সত্য হয়, অন্যান্য ব্রতাচারণ সত্য হয়, তপস্যা সত্য হয় পবিত্রতা সত্য হয়, তবে সেই পূণ্য বলে এই ব্রাহ্মণ বেশী ধর্ম নিশ্চিতই সন্তাপ মুক্ত হোন। যদি সর্বাত্মা নারায়ণ সত্য হয়, জ্ঞানাত্মক শিব সত্য হয়, তা হলে

এই ব্রাহ্মণ রূপী ধর্ম মৎ- প্রদত্ত শাপমুক্তি বিষয়ে নিশ্চিত রূপে সন্তাপ মুক্ত হোন।

ইত্যবসরে ধর্মপত্নী মূর্তিদেবী আগমন করে শোকে ব্যাকুলা হয়ে ভূতলে পতিতা হলেন। মূর্তিদেবী শ্রী বিষ্ণুর পাদপদ্মে মস্তক স্থাপন করে বলতে লাগলেন—" হে নাথ! হে করুণাময় জগন্নাথ! আমার প্রিয়তম পতিকে সত্বর জীবিত করুন। সতী নারীর একমাত্র পতিই গতি। একমাত্র পতিই সতীর অভিলষিত বস্তু দানে সমর্থ। হে দীনবন্ধো! আমার পতির প্রাণ দান করুন। ভগবান বিষ্ণুর চরণ কমলে এভাবে প্রার্থনা করে ধর্মপত্নী মূর্তিদেবী তথায় অবস্থান করে রোদন করতে লাগলেন।

শ্রী ভগবান বললেন-"হে বৃন্দে! তুমি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার আয়ু পরিমিত আয়ুলাভ করেছ। সেই আয়ু তুমি ধর্মকে প্রদান করে গোলোক ধামে গমন কর। তোমার এই তপস্যা দ্বারা তুমি পরে আমাকে নিশ্চিত রূপে প্রাপ্ত হবে। বরাহ কল্পে তুমি গোলোক বৃন্দাবন হতে এই ব্রজমণ্ডলে এসে জন্ম লাভ করবে। রাস মণ্ডলে রাধিকা ও গোপীগণের সাথে আমাকে প্রাপ্ত হবে। ভগবান বিষ্ণুর কথা শ্রবণ করে বৃন্দা নিজের আয়ু প্রদান করলেন। তখন তপ্ত স্বর্ণ বর্ণ বিশিষ্ট পূর্ণ ধর্ম উত্থিত হলেন এবং পূর্ব হতেও সুন্দর রূপ ধারণ করে শ্রীমান ধর্ম বিষ্ণুকে প্রণাম করলেন।

শ্রীবৃন্দাদেবী বললেন- "হে দেবগণ! আমার বাক্য অলঙ্ঘনীয়, আপনারা সাবধানে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আপনারা অবগত হোন যে, আমার বাক্য কখনোই মিথ্যা হবে না। আমি ক্রোধান্বিতা হয়ে পূর্বে তিনবার "ক্ষয়ো ভব"- বলে শাপোক্তি প্রদান করেছি। পুনরায় বলতে উদ্যতা হলে সূর্যদেব এসে আমাকে নিবারণ করেন। ধর্ম যে রূপে পূর্বে এবং এখন বিরাজিত আছেন, সেরূপে সত্যযুগে ইনি পরিপূর্ণ রূপে বিরাজ করবেন। ত্রেতাযুগে তিন পাদ ও দ্বাপরে দ্বিপাদ রূপে অবস্থান করবেন। কলি যুগে ধর্ম একপাদে অবস্থান করবেন। কলির শেষে (ষোড়শাংশ) কলা রূপে (১৬- ভাগের একভাগ) অবস্থান করবেন।

পুনরায় আবার সত্যযুগ এলে পূর্ববৎ চারিপাদে অর্থাৎ পূর্ণ রূপে অবস্থান করবেন। যেহেতু আমার মুখ হতে তিনবার ক্ষয় শব্দ নির্গত হয়েছে সেহেতু ক্রমানুসারে প্রতিযুগে

একপাদ করে ধর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হবেন। পুণরায় চতুর্থ বার ক্ষয় প্রাপ্তি রূপে শাপ দানের কথা মনে উদিত হলে সূর্যদেব আমাকে নিবারণ করেন। সেই কারণে ধর্ম কলির শেষে কলাময় হবেন। পূর্বে আমার শাপদানের পর ধর্ম যেরূপ দুর্গম সংকট কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেরূপ কলির শেষেও ইনি নিশ্চিত ক্ষয়প্রাপ্ত হবেন।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহারাজকে বললেন- হে পিতঃ! এভাবে যখন বৃন্দা ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন তখন গোলোক হতে এক অতীব সুন্দর ও শুভকর রথ এসে উপস্থিত হলো। সমস্ত দেবগণ অপূর্ব সুন্দর রথ দর্শন করলেন। এই রথ মূল্যবান রত্ননির্মিত উৎকৃষ্ট বস্ত্র, পুষ্পাদি দ্বারা অপূর্ব রূপে সজ্জিত ছিল। শ্রীবৃন্দাদেবী বিষ্ণু-ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবগণকে প্রণাম করে রথ দর্শন পূর্বক তাতে আরোহন করে গোলোক বৃন্দাবনে গমন করলেন। দেবগণ স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

শ্রীশ্রীরাধামাধব, ইস্‌কন, শ্রীমায়াপুর।

তৃতীয় স্তবক

।। বৃন্দাদেবীর শ্রীবিগ্রহ প্রকট রহস্য।।

লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অবসানে বজ্রনাভ ব্রজে দেবী চতুষ্টয়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তার মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের বৃন্দাদেবীর বিগ্রহ অন্যতম। [illegible] প্রভাবে বৃন্দাদেবীর শ্রীবিগ্রহ বৃন্দাবনের ব্রহ্মকুন্ড তটে সংগোপনে অবস্থান করছিলেন।

এক সময়ে শ্রীল রূপ গোস্বামী স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে ব্রহ্ম কুণ্ডতট হতে শ্রীবৃন্দাদেবীর বিগ্রহ প্রকট করেন। "শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বলেছেন—

"শ্রীরূপে শ্রীবৃন্দা স্বপ্নচ্ছলে জানাইলা।
ব্রহ্ম কুণ্ড তট হৈতে তাঁরে প্রকাশিলা।।
শ্রীবৃন্দাদেবীর শোভা মহিমা অপার।
সর্বকার্য সিদ্ধ হয় হৈলে কৃপা তাঁর।।"—
"সাধন দীপিকা" গ্রন্থে বলা হয়েছে —
"ব্রহ্মকুণ্ডতটোপান্তে বৃন্দাদেবী প্রকাশিতা।
প্রভোরাজ্ঞা বলেনাপি শ্রীরূপেন কৃপাব্ধিনা।।"—

অনুবাদঃ— মহাপ্রভুর আদেশ বলে কৃপাসিন্ধু শ্রীরূপ গোস্বামী ব্রহ্মকুণ্ডের তট সমীপে শ্রীবৃন্দাদেবীকে প্রকট করেছিলেন ।

তাঁর দিব্য সৌন্দর্য সম্পর্কে বন্দনা করে বলা হয়েছে—

"চূড়ায়াং চারুরত্নাম্বর মণি মুকুটং
বিভ্রতীং মূর্দ্ধি দেবীং
কর্ণদ্বন্দ্বে চ দীপ্তে পুরট বিরচিতে
কুণ্ডলে হারিহারান্।
নিষ্কং কাঞ্চীং সুহাসাং ভূজকট কতুলা

কোটি কাদীং চ বন্দে
বৃন্দাং বৃন্দাবনান্তঃ সুরুচির বসনাং
শ্রীল গোবিন্দ পার্শ্বে।।"—

অনুবাদঃ—শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে শ্রীল গোবিন্দ দেবের পার্শ্বে বিরাজিতা, মস্তক চূড়ায় চারু রত্নাম্বর ও মণি মুকুট, কর্ণ যুগলে স্বর্ণ রচিত উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়, বক্ষে সুচারু হার ও পদক কটিতে সুবিকশিত চন্দ্রহার, হস্তে বলয়, চরণে নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কার ধারিণী, অতিমনোহর বস্ত্র পরিহিতা শ্রীবৃন্দাদেবীকে বন্দনা করি।

শ্রীবৃন্দায়াঃ পাদাজ্জেং সুরমুণি-
সকলৈশ্চাপি ভক্ত্যানুবন্দ্যং
প্রেম্না সংসেব্যমানং কাল-
কলুষ হরং সর্ব্ববাঞ্ছা প্রদঞ্চ।
বক্তব্যং চাত্র কিম্বানু যদনু-
ভজতো দুর্লভে দেবলোকেঃ
শ্রীমদ্বৃন্দাবনেহস্মিন্ নিবসতি-
মনুজঃ সর্বদুঃখৈ বিমুক্তঃ।।"—

অনুবাদঃ— দেবতা ও মুণিগণের সর্বদা ভক্তি সহকারে বন্দনীর শ্রীবৃন্দাদেবীর পাদপদ্ম প্রেমভরে সম্যগ রূপে সেবিত হলে কলিকলুষ হরণ করেন এবং সর্ব অভীষ্ট প্রদান করেন। সেই পাদপদ্মে নিত্য ভজন পরায়ণ ব্যক্তি সর্ববিধ দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে দেবগণেরও দুর্লভ শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন।

এক সময় বৃন্দাবনে যবন অত্যাচার হলে ব্রজের বিগ্রহগণ জয়পুরে স্থানান্তরিত হয়। বৃন্দাদেবীর বিগ্রহ অনুরূপভাবে জয়পুরের রাজা রাজধানী জয়পুরে স্থানান্তরিত করা কালীন নন্দ গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে গুপ্তকুণ্ডের সন্নিকটে রেখে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম করেছিলেন। সেই জন্য ঐ স্থানের নাম বৃন্দাস্থলী এবং নিকটস্থ কুণ্ডের নাম বৃন্দাকুণ্ড। বর্তমানে সেখানে একটি বৃন্দাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর

বিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরকারী লোকজন গাড়ী নিয়ে কাম্যবনে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মকুণ্ডের তটেপ্রাপ্ত বৃন্দাদেবীর বিগ্রহ এখন কাম্যবনেই বিরাজিত। কাম্যবনে বৃন্দাদেবীর অবস্থান সম্পর্কে "ভক্তমাল গ্রন্থে"— বলা হয়েছে—

"ব্রহ্ম কুণ্ড হইতে বৃন্দাদেবী উঠিলা।
এবে কাম্যবনে যেহ যাইয়া রহিলা।।
রাজা জয়সিংহ জয়পুরে লয়্যা যায়।
কাম্যবনে যাই তথা বিশ্রাম করয়।।
রাত্রে রহি প্রাতঃ কালে গমনে উদ্যোগে।
লইয়া যাইতে চাহে রথের সংযোগে।।
উঠাইতে না পারিল দশজনে ধরি।
যাইতে বাসনা নহে হইলেন ভারি।।
আশয় বুঝিয়া রাজা নিরস্ত হইল।
তথায় মন্দিরাদি বানাইয়া দিল।।"—

অদ্যাবধি শ্রীমতী বৃন্দাদেবী কাম্যবনে অবস্থান করছেন এবং ভক্তগণকে দর্শন দান করছেন।

চতুর্থ স্তবক

।। শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেকে বৃন্দা দেবীর ভূমিকা।।

শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীমতী রাধারাণীর রাজ্যাভিষেকে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। শ্রীপৌর্ণ মাসী দেবীর আজ্ঞা ক্রমে বৃন্দাবনে তিনি রাধারাণীর বৃন্দাবন রাজ্যের অভিষেক নির্মিত্ত আকাশ বাণী করে পৌর্ণমাসী দেবীকে নিয়ে এক মহতী সভার আয়োজন করেছেন। সভানেত্রী শ্রীপৌর্ণ মাসীদেবী ও প্রস্তাবিকা শ্রী বৃন্দাদেবী। প্রস্তাবিকা বৃন্দাদেবী সভানেত্রী পৌর্ণ মাসী দেবীর প্রতি বললেন—

"হে যোগেশ্বরি! বৃন্দাবন রাজ্যে শ্রীরাধাকে অভিষিক্ত করুন। যেহেতু আমাদের অগ্রে অশরীরী আকাশবাণী স্পষ্ট রূপে এরূপ আদেশ করেছেন।—

(১)

"বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া রাই চারিপানে চায়।
হেনকালে বৃন্দাদেবী আইলা তথায়।।
বিনোদিনী কহে বৃন্দে কহ সমাচার।
বৃন্দাকহে, আজ বনে আনন্দ অপার।।"—

বৃন্দা হাসিয়া সম্মুখে বসিয়া
কহয়ে মধুর করি।
শুন বিনোদিনী সুখের কাহিনী
শুন সব সহচরী।।
আজু বনমাঝে অপরূপ সাজে
রাজা হৈলা শ্যামরায়।
যত শুক- শারী ময়ূর ময়ূরী
সবে জয় জয় গায়।।

রাখালে রাখালে মিলিয়া সকলে
সাজাইল রাজবেশ।
কেহ পাত্র মিত্র কেহ ধরে ছত্র
কেহ বা কোটাল বেশ।।
রাখাল রাজার হৈল দরবার
সভা হৈল কতজনে।
কেহ দণ্ড ধরি কারে চোর করি
স্ববলে ধরিয়া আনে।।
পতাকা ধরিয়া কেহ বা ডাকিয়া
কাননে কাননে ধায়।
রাখাল রাজার সব অধিকার
দেহ সবে জয় জয়।।
কানু বনে রাজা সবে তার প্রজা
পশুপাখী নরনারী।
শুনি চমকিতা বৃষভানু সূতা
আর সব সহচরী।।

(২)

ললিতা কহিছে বৃন্দা শুনহ বচন।
কহিবার কথা নয় অযোগ্য কথন।।
এই বৃন্দাবনে রাইকে রাজরাজেশ্বরী।
করিলেন যোগমায়া অভিষেক করি।।

....

হেন রাজ রাজেশ্বরী অপমান করি।
কাননে হৈল রাজা শ্যাম বংশীধারী।।
তোমরা সকলে মিলি করহ বিচার।

রাজ্যপহরণ দোষের কি হয় প্রতিকার।।
বৃন্দাদেবী বলে শুন সব সখীগণ।
যদি কেহ করে কারো রাজ্যপহরণ।।
উভয় রাজার যুদ্ধ এই সুবিচার।
জয় পরাজয় মানি হবে প্রতিকার।।
পরাজিত রাজারে লইয়া বন্দিশালে।
যে হয় উচিৎ শাস্তি বুঝহ সকলে।।
বৃন্দার বচন শুনি কহে ধনি রাই।
এই বৃন্দাবনে রাজা আর কেহ নাই।।

. . . .

যাও দূতী ত্বরা করি দেহ সমাচার।
সমরে সজ্জিত হঞা হবে আগুসার।।
কটাক্ষেতে জর জর করি তণুখানি।
এক কালে পঞ্চবান হৃদয়েতে হানি।।
বন্দি করি রাজারে রাখিব কারাগারে।
জানিব কেমন রাজা যুঝুক আমারে।।
ললিতা কহিছে শীঘ্র রাইকে সাজাও।
শ্রীরাধার জয় দিয়া মদনে জাগাও।।
ষড়ঋতু বসন্তাদি সেনাপতি গণে।
আজ্ঞা দেহ রতিযুদ্ধে হবে আগুয়ানে।।
আসুক মদন করে লয়ে পঞ্চবান।
কোকিলার কুহুরবে মাতুক পরাণ।।
নুপুর কিঙ্কিণী রণবাদ্য কলরবে।
কাপুক নিকুঞ্জবন জয় জয় রবে।।

(৩)

রাইর আদেশে ধরি নিজ শিরে
কানন দেবতী চলে।
কুঞ্জবনান্তরে পাইয়া শ্যামেরে
কহে চিত কুতূহলে।।
শুন রসরাজ বৃন্দাবন মাঝ
একেলা কিশোরী রাজা।
তাঁহারে লঙ্ঘিয়া উনমত হঞা
সাজিলে রাখাল রাজা।।
হইয়া কুপিতা সমরে সজ্জিতা
রাজ রাজেশ্বরী প্যারী।
পাঠাল আমারে কহিতে তোমারে
এবে বুঝহ বিচারি।।

(৪)

সাজল শ্যাম সুরত রণ-পন্ডিত
করে করি কুসুম কামান।
সৌরভে ভ্রময়ে কতহুঁ কত মধুকর
জিতল মনমথ বান।।
ধনি ধনি! অপরূপ ছান্দে
বেশ বিলাস রসময় মাধুরী
কামিনী-লোচন- ফাঁদে।
চূয়া চন্দন অগোর বিলেপন
সংযোগে বিবিধ বিচিত্রে।।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝন্‌ঝন্ রণরণি
রতিরণ বাজন বাজে।

অপরূপ ছান্দে রসিক শিরোমণি
সাজল রমণী-সমাজে।।

(৫)

দুহুঁ দুহুঁ নয়ানে নয়ানে ভেল মেলি।
লখই না পারি কলহ কিয়ে কেলি।।
গদ গদ বচন কহই নাহি পারি।
যেছন রোখে অবশ রহু থারি।।

(৬)

রতি রণে পরাভব মানিয়া মাধব
করযোড়ে পরিহার মাগে।
তুহুঁ রাজ রাজেশ্বরী তুয়া প্রজা বংশীধারী
জয় পত্র লিখি লেহ আগে।।
এত বলি শ্যাম রায় বৃন্দারে ডাকিয়া কয়
আজি হৈল বড় শুভক্ষণ।
মোরে পরাভব করি রাজা হৈল রাই কিশোরী
অভিষেক কর আয়োজন।।

(৭)

রাজ আবরণ লয়ে সখীগণ
কহে সুমধুর বাণী।
এসগো কিশোরী অভিষেক করি
সিংহাসনে বৈস ধনি।।
যমুনার নীর অতিমনোহর
হেমঘট পুরি আনে।
কদলী সুন্দর বৃক্ষ মনোহর
রোপিয়ে স্থানে স্থানে।।

বাজয়ে ভেঙরী মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী
রবাব খমক বীনা।
জগ ঝম্প বাজে পাখোয়াজ সাজে
বলে গায় তান নানা।।
পঞ্চগব্য লয়ে নীর মিশাইয়ে
সুগন্ধি চন্দন তার।
জয় জয় ধ্বনি করয়ে গোপিনী
সঘনে মঙ্গল গায়।।
সব গোপ নারী রহে সারি সারি
বাধার বদন চেয়ে।
বৃন্দা পরতেকে করে অভিষেকে
মাঙ্গলিক দ্রব্য লয়ে।।

(৮)

অভিষেক হেরি লুবধ মুরারি
অলখিতে বৃন্দা পাশ।
আসি কহে দেবি! নিজ হাতে সেবি
হেন মনে অভিলাষ।।
বৃন্দা কহে কান! করহ সেবন
যেমন যেমন মন।
পাতল চিরে মাজয়ে শরীরে
অতি হরষিত মন।।

ধরিতে চরণ মেলিয়া নয়ন
বঁধুরে হেরিয়া রাই।
কি কর কি কর রঙ্গিয়া নাগর

তোমার বালাই যাই।।
আর কত সাধ আছে প্রাণনাথ
বলিয়া কয়ল কোর।
ও রূপ নেহরি প্রিয় সহচরী
আনন্দ রসেতে ভোর।।
সিনান সমাধল মুছল অঙ্গ।
পহিরণ নীলিম বসন সুরঙ্গ।।
মণিময় আভরণ সহচরী দেল।
যাহা সেই শোভল পহিরণ কেল।।
মণি মন্দির যাহা আওল রাই।
রতন সিংহাসে বৈঠল যাই।।
বনফুল মালা দেয়ল বনদেবী।
ঐছন চন্দনে বহুমত সেবি।।
বৃন্দাবনেশ্বরী করি ভেল মান।
ডাহিনে ললিতা বিশাখা বৈসে বাম।।
ধরিলা কুসুমছত্র চিত্রাদেবী মাথে।
শ্রীচম্পক লতা সে তাম্বুল দেই হাতে।।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা চামর ঢুলায়।
রঙ্গদেবী সুদেবী রাধার যশ গায়।।

(৯)

কম্পিত নাগরে কম্পিত দেখি রসবতী রাই।
হাসি হাসি বধু করে ধরিলেন যাই।।
গদগদ কণ্ঠে কহরে ধনী বাণী।
মরম কহিয়ে এবে শুন বনমালী।।
নিজ বাঞ্ছা পুরাইলে মোরে রাজা করি।

মোর সাধ পুরাইতে হইবে মুরারি।।
ও বেশ ফেলিয়া নিজ বেশ পর তুমি।
সিংহাসনে বৈসহ কিঙ্করী হই আমি।।
বৃন্দাদেবী নাগরের বেষ ঘুচায়িয়া।
রাজবেষ করি দিল যতনে করিয়া।।
রসময় রসিক শেখর বনোয়ারী।
বসিলেন সিংহাসনে বামেতে কিশোরী।।
আহা মরি কিরা শোভা হেরগো নয়নে।
তুলনা নাহিক যার এ তিন ভুবনে।।
হেরি সব সখীগণ দেই জয় জয়।
বৃন্দাদেবী কহে আজ কি আনন্দ হয়।।"—

(১০)

"রাই রাজরাজেশ্বরী শ্যাম রসরাজ।
তণু তণু মিলন অপরূপ সাজ।।
তাই এক রঙ্গিনী পরম রসাল।
দুঁহু গলে দেয়ল এক ফুল মাল।।
চামর বীজই কোই দুঁহু অঙ্গে।
নাচত গাওত প্রেম তরঙ্গে।।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
দুঁহু গাওত আনন্দে মগন।।"—

(১১)

"আহা মরি! কিবা দুটি রূপ অনুপাম।
আধরসে ঢরঢর নবঘন শ্যাম।
চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক ঠাম।।
....
কিয়ে কমল ভ্রমর কিয়ে চাঁদেতে চকোর

চাতকিনী সুবদনী জলধর শ্যাম।।
নাচে ময়ূর ময়ূরী গয়ে শুক আর শারী
ফুলে ফুলে ভ্রমরা ভ্রমরী ধরু তান।
নব জলদ- কোলে থির বিজুরী খেলে
কত রস বরিখয়ে দুঁহু রসধাম।।
যত সখী মঞ্জরী দোহার মাধুরী হেরি
বোলত ঘেরি ঘেরি "জয় রাধেশ্যাম"।
যত সহচরী গণ করে পুষ্প বরিষণ
রাধা রাধারমণ বলি গায় অবিরাম।।"——

শ্রীমতী বৃন্দাদেবী এভাবে শ্রীরাধার অভিষেকাদির অনুষ্ঠান সমাপন করলেন। ললিতা- বিশাখাদি বিভিন্ন জন বিভিন্ন সেবার অধিকার লাভ করলেন। বৃন্দাদি বনদেবী গণ রাধাকৃষ্ণকে সম্ভাষণাদি করলেন। সগণ বৃন্দাদেবী সসম্মানে উত্তম আভারণাদি লাভ করে বনভূমি পালনের কার্যে নিযুক্তা হলেন।

খ) শ্রীবৃন্দাদেবীর কাছে রূপ- রঘুনাথের প্রার্থনা ঃ—

শ্রীধাম, শ্রীধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কৃপা না হলে পরমাভীষ্ট সেব্য বস্তুর সন্ধান জানা যায় না। নিত্য সিদ্ধ জীব হয়েও সাধক ভক্ত রূপে শ্রীরূপ- রঘুনাথ রাধা-মাধবের দর্শনের জন্য শ্রীবৃন্দাদেবীর কাছে প্রার্থনা করেছেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ শ্রীরাধা মাধবের সেবার উৎকণ্ঠা সিন্ধুতে উচ্ছ্বলিত হয়ে বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবীর কাছে প্রার্থনা করেছেন—

"তবারণ্যে দেবি ধ্রুবমিহ মুরারির্বিহরতে,
সদা প্রেয়স্যেতি শ্রুতিরপি বিরৌতি স্মৃতিরপি।
ইতি জ্ঞাত্বা বৃন্দে চরণমভিবন্দে তব কৃপাং
কুরুস্ব ক্ষিপ্রংমে ফলতু নিতরাং তর্ষবিটপী।।"
—উৎকলিকা বল্লরী-৩

অনুবাদঃ— হে দেবি বৃন্দে! শ্রুতি- স্মৃতি শাস্ত্র সমূহ কীর্তন করছেন যে, তোমার অরণ্য শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ নিত্য বিহার করেন। এ কথা জেনে তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করছি।— তুমি কৃপা কর যেন আমার আশা তরু ফলবতী হয় অর্থাৎ শ্রীরাধা কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়।

রাধা মাধবের দর্শন লালসার আবেগে উৎকণ্ঠিত রূপগোস্বামীর চিত্ত ব্যাকুল। এ প্রকার ব্যাকুলতা তুলনা রহিত। ইষ্ট প্রাপ্তির অভাবে ভাবরাজ্যে ভক্তের উৎকণ্ঠা অতি প্রবল আকার ধারণ করে। ইষ্ট প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরম সুস্বাদু অন্নাদি পুণঃ পুণঃ ভোজনেও তার ক্ষুধার শান্তি হয় না, এরূপ যদি দুর্দমনীয় ক্ষুধা সম্ভবপর হয় তবে উৎকণ্ঠিত ভক্তের যুগল মাধুরী দর্শন লালসার সঙ্গে সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। প্রবল উৎকণ্ঠিত ভক্তের কাছে স্বজন গণ জলশূণ্য কূপের ন্যায়, গৃহ কন্টক যুক্ত বনের ন্যায়, সজ্জনকৃত প্রশংসা সর্পাদি দংশনের ন্যায় মনে হয়। পূর্বে যা অভীষ্ট বলে মনে হত এখন তা উপদ্রব্যের ন্যায় বোধ হয়।

এরূপ ভক্তের যখন যুগল মাধুরী দর্শন লাভ হয়। তখন স্বাদুলোলুপ ব্যক্তি মধুর অমৃত পান করলে যে আনন্দ লাভ হয় তার সাথে কিঞ্চিত তুলনা দেওয়া যায় মাত্র। বস্তুতঃ জাগতিক কোন আনন্দ দ্বারা ঐ আনন্দের তুলনা হয় না। কারণ বিষয়ানন্দ মায়াশক্তির বৃত্তি, আর ভক্তের আনন্দ স্বরূপ শক্তির বৃত্তি। এই প্রকার নিত্য আনন্দ প্রদানের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তকে স্বীর বিরহ জ্বালা ভোগ করান। শ্রীযুগল দর্শনে উৎকণ্ঠিৎ রূপ গোস্বামীও এভাবে বিরহ জ্বালা ভোগ করে শ্রীবৃন্দাদেবীর কাছে যুগল মাধুরী দর্শনের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন।

সহসা অন্তরে জেগে উঠল বৃন্দাবনাধিষ্ঠাত্রী শ্রীবৃন্দাদেবীর কৃপার স্মৃতি। শ্রীবৃন্দাদেবী বিচিত্র শোভা সম্পদে বৃন্দাবনকে বিভূষিত করে রেখেছেন। যেখানে রাধা কৃষ্ণ নিত্য বিহার পরায়ণ। রূপ গোস্বামী বৃন্দাদেবীর কাছে প্রার্থনা করেছেন—"হে বনদেবী বৃন্দে! রাধামাধব তোমার সম্পদ। তোমার সম্পদ যুগল -চরণ ইচ্ছা করলে তুমি দিতে পার। হে দেবি! আমাকে এই কৃপা কর যেন আমার আশাতরু ফলবতী হয়।

অর্থাৎ আমি যেন শ্রীযুগল দর্শন করে ধন্য হতেপারি। তোমার সেবার বৈশিষ্ট্য এই যে,—"ফলতু নিতরাং তর্ষ বিটপী—"অর্থাৎ যুগল সেবার জন্য তোমার আদেশে বৃন্দাবনের বৃক্ষ- বল্লী যেমন অকালেও পুষ্পিতা বা ফলবতী হয়, সে রূপ যুগল চরণ দর্শনের কোন উপযোগী সাধন না থাকলেও তুমি নিজ গুণে কৃপা করে আমার এই অভীষ্ট পূর্ণ কর।

শ্রীবৃন্দাদেবীর কাছে তার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করলেন। "উৎকলিকা বল্লীর" গ্রন্থের ৪র্থ শ্লোকে —

"হৃদি চিরবসদাশা মণ্ডলালম্বপাদৌ,
গুণবতী তবনাথৌ নাথিতুং জন্তুরেষঃ।
সপদি ভবদনুজ্ঞাং যাচতে দেবি বৃন্দে,
ময়ি কির করুণাদ্রাং দৃষ্টিমত্র প্রসীদ।। উঃব,—৪

অনুবাদঃ— হে কারুণ্যে গুণ শালিনী বৃন্দাদেবী! চিরকাল যাদের শ্রীচরণ দর্শন আশা হৃদয়ে ভরপুর সেই রাধা মাধব তোমারই নাথ। আমি তাঁদের প্রাপ্তির পূর্বে তোমার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করছি। তুমি প্রসন্না হয়ে অতি শীঘ্রই এ দীনের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি দাও। শ্রীলরূপ গোস্বামীর হৃদয়ে রাধা মাধবের দর্শন লাভের আশা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শত সহস্র অযোগ্যতার স্মৃতিতেও প্রাপ্তির আশা ত্যাগ করা যায় না, যখন নিজের অযোগ্যতার স্ফূর্তিতে নিরাশার অন্ধকারে হৃদয়াকাশ সমাচ্ছন্ন, তখন অভীষ্টের করুণার স্মৃতি নিজের হৃদয়কে আশার আলোকে উদ্দীপ্ত করে। আশাও নিরাশার আঘাতে শ্রীরূপের হৃদয় আন্দোলিত হচ্ছে। তথাপিও তাঁর বিশ্বাস অভীষ্টের কৃপা সমস্ত অযোগ্যতার সমাধান করে। রাধা মাধবের দর্শন তিনি পাবেনই। তাই শ্রীবৃন্দাদেবীর কাছে প্রার্থনা করছেন।

প্রকৃত পক্ষে শ্রীল রূপ গোস্বামী রাধামাধবের নিত্য পার্ষদ। তাঁদের দর্শন ও সেবাতেই তার আবেশ। সাধক জগতে এসে আমাদের মায়াবদ্ধ জীবদের শিক্ষা প্রদান করছেন যে, সাধক ভক্তের অভিলাষ যেন একমাত্র শ্রীযুগল চরণকেই কেন্দ্র করে হয়। জাগতিক

অর্থ সম্পদ, লাভ- পূজা- প্রতিষ্ঠাতা ইত্যাদি আবেশ থাকলে ভক্তির অস্তিত্বই থাকে না। অতি প্রযত্নশীল সাধক দৈন্যের সাধনায় অনর্থকে জয় করতে পারেন। সেই সঙ্গে রাধা মাধবের চরণে হৃদয়ের আবেশ সুরক্ষার চেষ্টাও করেন। ফলে তার চিত্তবৃত্তি ইতর বস্তুতে লুব্ধ হয় না।

চিরকালের কামনার ধন অভীষ্টে সেবার জন্য বৃন্দাদেবীর কাছে শ্রীরূপগোস্বামী চরণ জানালেন, হে বৃন্দাদেবী! তোমার কৃপা ভিন্ন শ্রীযুগল দর্শন লাভের অন্য কোন উপায় নেই। তুমি করুণা গুণের সিন্ধু। করুণার দৃষ্টিতে আমার প্রতি একবার দৃষ্টি পাত কর। তোমার করুণার দৃষ্টি রাধা মাধবের দর্শন সৌভাগ্য আমাকে দান করবে। তোমার কৃপায় অনন্ত মধুর যুগল রূপ আমার নয়ন সম্মুখে ভেসে উঠবে। তোমার অহৈতুকী কৃপা হলেই সেবা সৌভাগ্য লাভ করে আমি ধন্য হতে পারব।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী "শ্রীব্রজ বিলাস স্তবে" শ্রীবৃন্দাদেবীর মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে বলেছেন—

"প্রতি নব নব কুঞ্জং প্রেম পূরেণ পূর্ণা
প্রচুর সুরভি পুষ্পৈ ভূষযিত্বা ক্রমেন।
প্রণয়তি বত বৃন্দা তত্র লীলোৎসবং যা
প্রিয়গণ বৃত- রাধাকৃষ্ণয়োস্তাং প্রপদ্যে।।"—

অনুবাদঃ— যিনি প্রেমরসে নিমগ্ন হয়ে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নব নব বিলাস কুঞ্জ সমূহ প্রচুর সুগন্ধি কুসুমে ভূষিত করে সখীগণ পরিবৃত শ্রীরাধা কৃষ্ণের মধুর লীলারস বিস্তার করেছেন সেই বৃন্দাদেবীর চরণে আমি শরণাগত হলাম।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী আলোচ্য শ্লোকে বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবীর চরণে শরণাগত হয়েছেন। মাধুর্যময় প্রেমের ধাম বৃন্দাবন, সহস্র সহস্র বনদেবীর অধ্যক্ষা বৃন্দাদেবী সখীগণ সহ রাধামাধবের বিহার ভূমি শ্রীবৃন্দাবন ও নিকুঞ্জ বলীকে নব নব সাজে সজ্জিত করেন। মাধুর্যময়ী লীলারাজ্য অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীবৃন্দা যুগল

বিলাসের একান্ত আস্পদ মধুময় বৃন্দাবনের প্রকৃতিকে প্রেমহস্তে মধুর থেকে মধুরত থেকে সজ্জিত করেন। প্রাণের দেবতা বিহার করবেন তাই বিচিত্র কুসুম সম্ভারে সুসজ্জিত ও সুরভীত করে রাখেন কুঞ্জাবলীকে। প্রেম পূজারিণী বৃন্দাদেবী প্রাণের দেবতা রাধামাধবের বিহারস্পদ প্রতিটি কুঞ্জমন্দিরকে কুসুমের মধুগন্ধে আমোদিত করেন। সুনিপুণ শিল্পি যেমন শিল্প নৈপুণ্যের দ্বারা নিয়োগকর্তার হৃদয়কে আকর্ষ করেন তেমনি প্রেম শিল্পি বৃন্দার প্রেম নৈপুণ্যে সুসজ্জিত বৃন্দাবন ও কুঞ্জাবলী সম শ্রীরাধামাধবের হৃদয়কে লীলারসের উদ্দীপনায় উন্মত্ত করে তুলে।
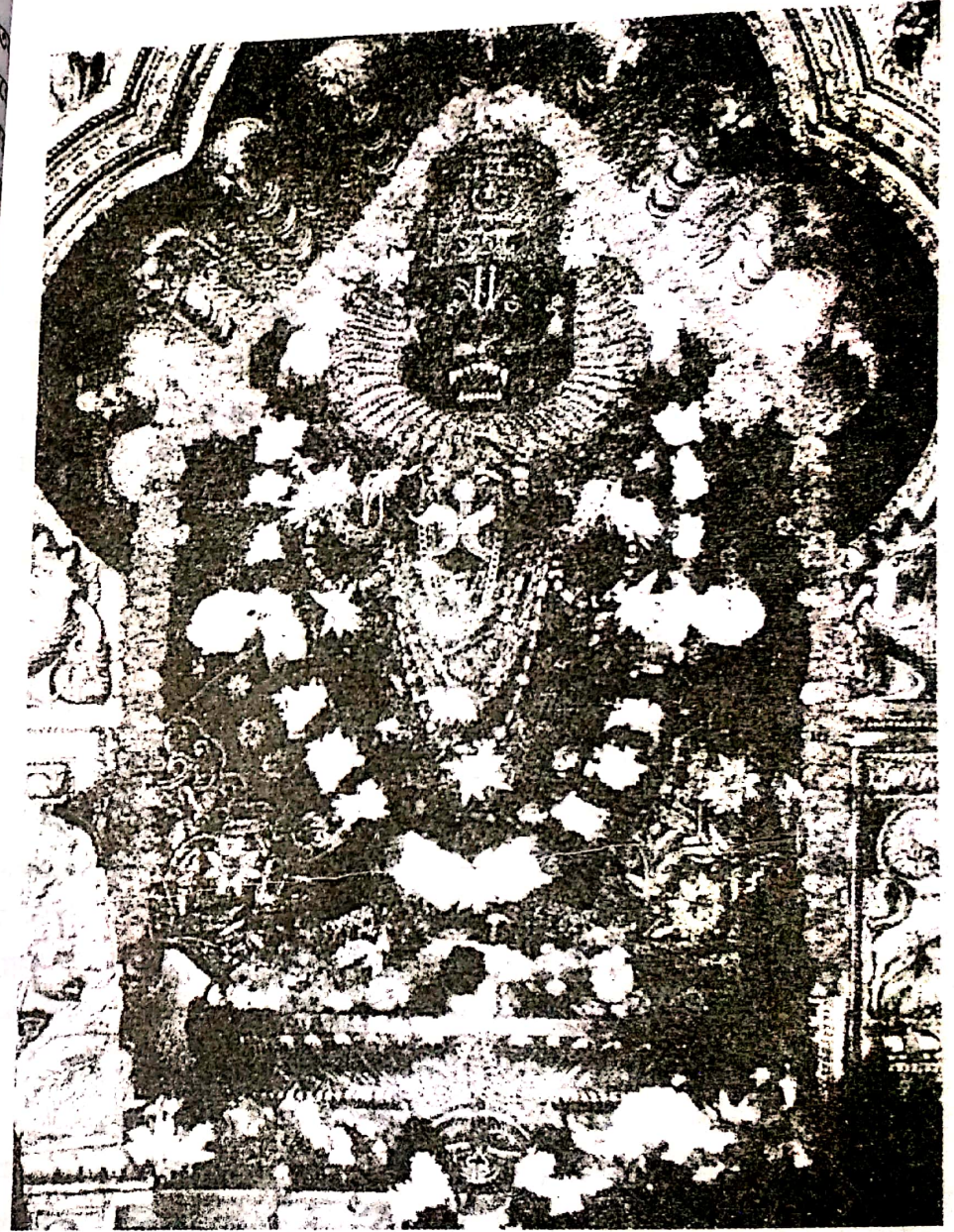
ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব, ইস্‌কন, শ্রীমায়াপুর।

পঞ্চম স্তবক

।। ঐকান্তিক সেবা নিষ্ঠায় শ্রীবৃন্দা দেবীর কৃপা।।

কাম্যবনে মদন মোহনের সেবা করতেন জয় কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ। এক সময় তরুণ বয়স্ক এক কনিষ্ঠ ভক্ত তাঁর কাছে ভজন শিক্ষার জন্য আসেন। কিছু দিন অতীত হলে কনিষ্ঠভক্তের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রাগানুগা ভজন শিক্ষা দিতে জয় কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ মনস্থ করলেন। বাবাজী কনিষ্ঠ ভক্তের কাছে তার গুরু প্রণালী জানতে চাইলেন। কনিষ্ঠ ভক্ত বললেন গুরু প্রণালী কি তা আমি জানি না এবং গুরুদেবের কাছে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাও করি নাই। মহারাজ বললেন- তুমি বাংলায় গিয়ে তোমার গুরুদেবের নিকট হতে গুরু প্রণালী নিয়ে এস। বাবাজী মহারাজের স্নিগ্ধ ব্যবহার ও আদর এবং মদন মোহনের সেবা ছেড়ে গৌড়দেশে যেতে হবে বলে কনিষ্ঠ বাবাজী কেঁদে আকুল। কিন্তু বাধ্য হবে কনিষ্ঠ ভক্ত দেশে যাত্রা করলেন। কনিষ্ঠ ভক্ত কাতর হয়ে শ্রীমতী বৃন্দাদেবী ও রাধারাণীর নিকট প্রার্থনা করলেন যে,- গাড়ীতে উঠার আগেই যেন ব্রজ ভূমে তার প্রাণ বিয়োগ হয়।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবী ও রাধা রাণী তার প্রার্থনা শুনলেন। কনিষ্ঠ ভক্ত গাড়ীর নিকট যাওয়ার পূর্বেই গাড়ী ষ্টেশন ছেড়ে চলে গেল। কনিষ্ঠ ভক্ত তখন আর কি করবেন। তিনি পুনরায় ভজন কুটিরে ফিরে আসার সংকল্প করলেন। এদিকে শ্রীবৃন্দাদেবী ঐ রাত্রে বাবাজী মহারাজকে ধমক দিয়ে বলছেন- "তুই কেন নবীন ভক্তকে বাহিরে পাঠাইলি? তার গুরু প্রণালী তো তোর ঠাকুরের সিংহাসনেই রয়েছে।"— বাবাজী মহারাজ চমকে উঠলেন। শ্রীবৃন্দাদেবীর পুনঃ দর্শন না পেয়ে কেঁদে কেঁদে আকুল হলেন এবং বৃন্দাদেবীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। প্রাতে স্নানাদি সেরে শ্রীমদন মোহনের মন্দিরে প্রবেশ করলেন। মদন মোহনের সিংহাসনে শ্রীগুরু প্রানালী পেয়ে বক্ষে ধারণ করলেন। শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর কৃপা স্মরণ পূর্বক শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে গিয়ে বৃন্দাদেবীর স্মরণ করে অনেক কাঁন্নাকাটি করলেন। এবং নবীন ভক্তকে ফিরিয়ে আনার

জন্য তার কাছে প্রার্থনা করলেন।

ঐ দিন সন্ধ্যাকালে নবীন ভক্ত ভজন কুটিরে ফিরে আসেন। বাবাজী মহারাজ নবীন ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন এবং কি প্রকারে ফিরে এলে? নবীন ভক্ত গাছ না পাওয়ার কথা সব খুলে বলল। বাবাজী মহারাজ নবীন ভক্তকে শ্রীবৃন্দাদেবীর কৃপার কথা স্মরণ করে তাকে আলিঙ্গন করে নয়ন জলে অভিষিক্ত করলেন। তারপর বৃন্দাদেবীর স্বপ্নের কাহিনী বিস্তারিত বললেন এবং গুরু প্রণালী ও যে প্রাপ্ত হলে তাও জানালেন।

ঃ ষষ্ঠ স্তবক ঃ
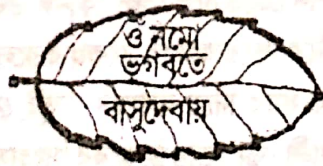
।। শ্রীবৃন্দাদেবীর কৃপায় নারদের কৃষ্ণলীলা দর্শন।।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর কৃপায় শ্রীল নারদ মুনি কৃষ্ণলীলা দর্শন করেছিলেন। "পদ্ম পুরাণ পাতাল খন্ডে" এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। দেবর্ষি নারদ এক সময় সদাশিবের কাছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রণালী জানতে চাইলেন। সদাশিব ব্রাহ্ম মুহূর্ত হতে আরম্ভ করে মহানিশা পর্যন্ত রাধা কৃষ্ণের সেবার কথা বললেন। নারদ আবার রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্পর্কে জানতে চাইলেন।—

"হরে দৈনন্দিনীং লীলাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
লীলামজানতাং সেব্যো মনসা তু কথং হরিঃ।।"—

অনুবাদঃ— নারদ বললেন হে দেব সদাশিব! আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলা যথাযথ ভাবে শ্রবণ করতে ইচ্ছুক। সে লীলা না জেনেই বা কিরূপে তাদের সেবা করব।

"এত শুনি মহাদেব কহে নারদেরে।
সে লীলা না জানি আমি কহিনু তোমারে।।
দৈনন্দিন লীলা কৃষ্ণের বৃন্দাদেবী জানে।
কহিবে তোমারে তিহোঁ যাহ তিহোঁ স্থানে।।
অতি দূর নহে কেশী তীর্থের সমীপে।
সখীবৃন্দ সঙ্গে আছে কৃষ্ণদাসী রূপে।।"

"নাহং জানামি তাং লীলাং হরে নারদ তত্ত্বতঃ।
বৃন্দাদেবীং সমাগচ্ছ সাতে লীলাং প্রবক্ষতি।।
অবিদূর ইতঃ স্থানাৎ কেশীতীর্থ সমীপতঃ।
সখী সঙ্গাবৃতা সাস্তে গোবিন্দ- পরিচারিকা।।"

অনুবাদঃ— সদাশিব বললেন- হে নারদ আমি শ্রীহরির সে নিত্যলীলা বিষয়ে অবগত নই। তুমি এ স্থান হতে বৃন্দাদেবীর নিকট গমন কর। তিনি তোমার নিকট সে লীলার বিষয় বর্ণনা করবেন। সেই গোবিন্দ পরিচারিকা বৃন্দাদেবী এ স্থান হতে অতি নিকটেই কেশীতীর্থের সমীপে সখীগণ পরিবেষ্ঠিতা হয়ে অবস্থান করছেন। সদা শিবের নিকট হতে এরূপ জ্ঞাত হয়ে মুনি শ্রেষ্ঠ নারদ তাঁকে প্রাণাম করে আনন্দ চিত্তে বৃন্দাদেবীর আশ্রমে গমন করলেন।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবী নারদকে দর্শন করে প্রণাম করলেন এবং বললেন হে মুনিবর, আপনার কুশল তো। এখানে আপনার আগমনের কারণ কি? তা খুলে বলুন—

"মনি প্রণমিয়া গেল বৃন্দার আশ্রমে।
মুনিরে দেখিয়া বৃন্দা কররে প্রণামে।।
বসিতে আসন দিয়া কৈল জিজ্ঞাসন।
কি কারণে তোমার হইল আগমন।।
নারদ কহেন আপনার বিবরণ।
নিত্যলীলা তোমার স্থানে করিব শ্রবণ।।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
বৃন্দাবন ধামে করে নিত্য বিলাসন।।
সে লীলা শুনিতে মোর লুব্ধ হয় মন।
কৃপা করি সেই লীলা করহ কথন।।"

নারদ বললেন- হে দেবী বৃন্দে। আমি আপনার নিকট শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি, হে শোভনে! যদি আমি তা শ্রবণের অধিকারী হই, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলা আপনি আমার কাছে তা ব্যক্ত করুন।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবী বললেন- হে দেবর্ষি নারদ! আপনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলা অতি গোপনীয় হলেও আমি তা ব্যক্ত করব। আপনি এই গোপনীয় লীলার বিষয় কাকেও প্রকাশ করবেন না।

"শ্রীবৃন্দোবাচ —

মধ্য বৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎ কুঞ্জ মণ্ডিতে।
কল্পবৃক্ষ নিকুঞ্জে তু দিব্য রত্নময়ে গৃহে।।"—

অনুবাদঃ— শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যস্থলের চতুঃপার্শ্বে পঞ্চাশৎ কুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত রমণীয় কল্পবৃক্ষের নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে দিব্যরত্নময় গৃহে শ্রীরাধাকৃষ্ণ অবস্থান করছেন।

শ্রীসৎকুমার তন্ত্রে শ্রীমতী বৃন্দাদেবী বললেন——

"শ্রীবৃন্দোবাচ—
কুঞ্জাৎ গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি
কুরুতে দোহনান্নাশমাদ্যাং।
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি
সখিভিঃ সঙ্গ বিচরয়ন্ গাঃ।।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি
বিপিনে রাধয়ার্দ্ধা পরাহ্নে।
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি।।
সুহৃদয়োঃ সকৃষ্ণোঽবতান্ন।।"

"সনৎ কুমার তন্ত্রে আছে বিশেষ বর্ণন।
সূত্র জানিবারে কৈল শ্লোক লিখন।।
বৃন্দা কহে মুনি এই সকল আখ্যানে।
সূত্র রূপে নিত্যলীলা কৈল নিবেদনে।।
যাহার শ্রবণে পাপী পাপ মুক্ত হয়।

ভক্তজন কৃষ্ণ- পাদপদ্মকে লভয়।।"

দেবর্ষি নারদ বললেন- হে বৃন্দাদেবী, তুমি কৃপা করে আমাকে রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা শ্রবণ করালে পুণরায় তোমাকে নিবেদন করি কিরূপে এই রাধাকৃষ্ণ লীলার দর্শন পাব।—

"এ কথা শুনিয়া বৃন্দা কহে নারদেরে।
পরম নিগূঢ় কথা সুধাইলে মোরে।।
রাধাকৃষ্ণ লীলা হয় অতি গোপনীয়।
স্বপ্নেও দর্শন যাহা না পায় দেবগণ।।
ব্রহ্মাশিব অন্তর গোচর যাহা নয়।
লক্ষ্মীর অগম্য সেই কৃষ্ণ লীলা হয়।।
তুমি সে রহস্য লীলা দেখিবে কেমনে।
দেব অগোচর লীলা অতি সঙ্গোপনে।।
কোন ভাগ্যবান রাগমার্গে দাণ্ডাইয়া।
যদ্যপি সাধন করে কামানুগা হৈয়া।।
স্বসুখ ছাড়িয়া কৃষ্ণ সুখ বাঞ্ছে মনে।
অতি গাঢ় লোভে পায় সে লীলা দর্শনে।।
সাধ্যবস্তু প্রেমসেবা ভাবিতে ভাবিতে।
দর্শনের যোগ্য দেহ লাভ করে অচিরাতে।।"—

এ ভাবে শ্রীবৃন্দাদেবীর মুখে রাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শনের কথা শ্রবণ করে নারদ মুনি বৃন্দাবনে সাধন করার বাসনা করলেন। তিনি বৃন্দাদেবীকে সন্মান ও পরিক্রমা করে নিত্য লীলা দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত হলেন। নারদ মুনি তারপর—

"বৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়া ভ্রময়।
দেখয়ে সর্বত্র লীলা স্থান রসময়।।
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ সতত করে গান।
তান মান মনোযন্ত্র হৈল একতান।।"—

দেবর্ষি নারদ রাধাকৃষ্ণ নাম কীর্তন করতে করতে ব্রজে সর্বত্র পরিভ্রমন করতে লাগলেন।

"জয় ব্রজভূমি জয় জয় বৃন্দাবন।
জয় লীলা স্থলী জয় গিরিগোবৰ্দ্ধন।।
জয় ব্রজবাসী বৃন্দ, জয় গোপীগণ।
জয় রাধা সখীবর্গ আমার জীবন।।
জয় রাধা কৃষ্ণলীলা সুমধুর অতি।
কৃপা করি দর্শন দেহ মোর প্রতি।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইল গিরি গোবর্দ্ধনে।
লীলাস্থলী কুণ্ড দেখি আনন্দিত মনে।।

বৃন্দাবন মধ্যে শ্রেষ্ঠ গিরি গোবৰ্দ্ধন।
হরিদাস বর্য্য যারে কহে গোপীগণ।।
যার মধ্যে কৃষ্ণ নিত্য গোপীগণ সঙ্গে।
নানাবিধ রস কেলি করে নানা রঙ্গে।।
ওহে গোবৰ্দ্ধন শুন এই নিবেদন।
কৃপা করি কর মোর অভীষ্ট পূরণ।।
রাগমার্গ যে কথা বৃন্দাদেবী কহিল।
অতিশয় লোভে সেই মত আচরিল।।
অল্পকালে নারদের সাধন সিদ্ধ হৈল।
সখীরূপা হৈয়া রাধাকৃষ্ণকে পাইলা।।

এভাবে শ্রীনারদ মুনি সদাশিবের নির্দেশে শ্রীবৃন্দাদেবীর কাছে রাধা-কৃষ্ণের লীলা দর্শনের জন্য সাধন ভজনের পন্থা শ্রবণ করেন এবং রাগানুগা মার্গে সাধন করে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে নিত্যলীলা দর্শনের যোগ্যতা লাভ করেন।

সপ্তম স্তবক

(ক) শ্রীবৃন্দাদেবী কর্তৃক কুঞ্জ ভঙ্গের নির্দেশ ঃ—

শ্রীমতী বৃন্দাদেবী নিশান্তকালে কিভাবে শ্রীযুগলের নিদ্রা ভঙ্গ হবে সময় সম্বন্ধে অভিজ্ঞা আজ্ঞানুবর্তী বিহগ কুলকে নিযুক্ত করে রেখেছেন যথা সময়ে কুঞ্জ ভঙ্গের জন্য। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ "গোবিন্দ লীলামৃতে "তার ইঙ্গিত প্রদান করেছেন—

"আসন যদর্থং প্রথমং দ্বিজেন্দ্রাঃ
সেবা- মসূৎকণ্ঠ ধিয়োঽপি মূকা ঃ।
বৃন্দা- নির্দেশং তমবাপ্য হর্ষাৎ
ক্রীড়া- নিকুঞ্জং পরিতশ্চু কূজু ঃ।।

(নিশান্ত— ১২)

অনুবাদঃ— শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর আজ্ঞানুবর্তী পাখীসকল কুঞ্জে পূর্বেই আগমন করে অবস্থান করছিল। অতপর বৃন্দাদেবীর আদেশক্রমে কুঞ্জের চারিদিকে আনন্দে কলরব করতে লাগল।

দ্রাক্ষা বল্লীতে শারীগণ; দাড়িম্ব বৃক্ষে শুকগণ, আম্রবৃক্ষে কোকিলগণ, পীলুবৃক্ষে কপোত কদম্ব বৃক্ষে ময়ূরগণ কলরব করতে লাগল। বিশেষ করে কোকিলকুল কন্দর্পে বীণাযন্ত্রের ন্যায় উচ্চ পঞ্চম তানে মহুমুর্হুঃ কুহু কুহু স্বরে আলাপ করতে লাগল।

" তথালিবৃন্দং মকরন্দ লুব্ধং
রতীশিতু মঙ্গল কম্বুতুল্যম।
প্রফুল্ল- বল্লীচয়- মঞ্জু কুঞ্জে
জুগুঞ্জ তল্পীকৃত- কঞ্জপুঞ্জে।।"

(নিশান্ত — ১৪)

অনুবাদঃ— অনন্তর মকরন্দ লুব্ধ অলিকুল কমলদ শয়ন শোভিত কুসুমিত লতাজাল ভূষিত কুঞ্জ মধ্যে যেন রতি পতির মঙ্গল শঙ্খধ্বনি সদৃশ গুঞ্জন করতে লাগল।

মধুপান মত্ত ভ্রমরীগণ মধুপানে মত্ত হয়ে গোবিন্দের প্রবোধনের নিমিত্ত ঝঙ্কারচ্ছলে ঝল্লরী নামক বাদ্য ধ্বনির ন্যায় গুন্ গুন্ শব্দ করতে লাগল।

এভাবে শ্রীমতী বৃন্দাদেবী সকলকে নির্দেশ প্রদান করে শ্রীযুগলের নিদ্রা ভঙ্গ করান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যেও শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর কুঞ্জভঙ্গের মাধুর্যময়ী নির্দেশ অতীব মহিমা মণ্ডিত। পদকর্তা গোবিন্দ দাসের একটি পদ অধিক আকর্ষণীয়। যথা—

কুঞ্জভঙ্গ (বিভাস)
বৃন্দাদেবী সময় জানিয়া।
পাখীগণে কহে সম্বোধিয়া।।
হেরে দেখ নিশি বহি গেল।
দশ দিশ অরুণিত ভেল।।
নিজ নিজ সুমধুর স্বরে।
জাগাও শ্রীরাধিকা শ্যামেরে।।
বৃন্দাদেবীর আদেশ পাইয়া।
সবে মিলি কহে সম্বোধিয়া।।
ওহে শ্যাম ব্রজেন্দ্র নন্দন।
মোরা কিছু করি নিবেদন।।
সুবদনি কর অবধান।
নিশি গেল হৈয়াছে বিহান।।
জাগো জাগো যুগল কিশোর।
অরুণ কিরণ হেরি ঘোর।।
কুমুদিনী তেজি অলি ধায়।

আর তো রহিতে না যুয়ায়।।
সখীগণ শুনি চমকিত।
পামরি গোবিন্দ চিত ভীত।।

— গোবিন্দ দাস

(খ) শ্রীবৃন্দা দেবীর নির্দেশে ষড় ঋতুর সেবা বৈচিত্র্য ঃ—

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমতী বৃন্দাদেবী বনে কুঞ্জ শোভা বৃদ্ধির জন্য ষড় ঋতুর প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত" গ্রন্থে দশম সর্গে ষড় ঋতুর সেবার বর্ণনা প্রদান করেছেন। শ্রীরাধা মাধব মঞ্জুল ব্যঞ্জল কুঞ্জে পরম সুখে অবস্থান কালীন পুষ্প কাননের নিকটে ললিতাদি সখীগণ সভা বিস্তার করে অবস্থান করছেন। এমন সময় নান্দীমুখী ও শ্রীমতী বৃন্দাদেবী দুই দিক হতে দুই জন উপস্থিত হলেন। সেই সভায় ছয় ঋতু লক্ষ্মী মূর্তিমতী হয়ে নিজ নিজ সেবার সুযোগ অবগত হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। মূর্তিমতী ষড় ঋতুকে দর্শন করে শ্রীমতী বৃন্দাদেবী বললেন—

"হে ঋতুলক্ষ্মীগণ! তোমরা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও বৃন্দাবনেশ্বরের প্রীত্যর্থে নিজ নিজ শোভাদ্বারা শীবৃন্দাবনের বন সমূহ বিভূষিত কর।

হে বসন্ত লক্ষ্মী! তুমি গোবর্দ্ধন গিরিবরের নিকটবর্তী রাস স্থলীতে অবস্থান কর। হে শরৎ লক্ষ্মী! তুমি যমুনা তটবর্তী কল্পতরু সন্নিকটবর্তী ভূমিতে অবস্থান কর। বসন্ত ও শরৎ ঋতুর প্রতি আদেশ করে পরে সকল ঋতু লক্ষ্মীকে সম্বোধন পূর্বক বললেন- হে সকল ঋতু লক্ষ্মীগণ! তোমরা সর্বস্ব সমর্পণের দ্বারা শ্রীরাধা কুণ্ডের সেবা করে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন করে ধন্য হও। শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্বদিকে বর্ষা, দক্ষিণে শরৎ, পশ্চিমে হেমন্ত, উত্তরে শীত রূপে অবস্থান করলেও তরুনিচয়ে বসন্তের প্রভাবে থাকবে। সখীগণ সহ শ্রীরাধা কৃষ্ণের জলকেলির নিমিত্ত জল মধ্যে গ্রীষ্মে ঋতুলক্ষ্মী অবস্থান কর। নিরুপমা ঋতুলক্ষ্মীগণ শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর এই নির্দেশ শ্রবণ করে তাকে প্রণাম পূর্বক নিজ নিজ সেবার নিমিত্ত গমন করলেন।

(গ) শ্রীবৃন্দাদেবী কর্তৃক বনের শোভাদি বর্ণনা ঃ—

শ্রীমতি বৃন্দাদেবী রাধাকৃষ্ণকে ব্রজের বনশোভা দর্শন করান। শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে বলা হয়েছে——

"ততো বৃন্দাটবীঃ বৃন্দা স্ফীতাং তত্তদৃতুশ্রিয়া।
দর্শয়ন্তী স্বনাথৌ তাবভাষত পুরোগতা।।"

শ্রীবৃন্দাদেবী রাধাকৃষ্ণের অগ্রবর্তিনী হয়ে ষড়ঋতু শোভিত বৃন্দাবনকে দর্শন করিয়ে বলতে লাগলেন- হে রাধা কৃষ্ণ! এই বন সখী দিগের ন্যায় শোভিত হয়ে বিলাস পরায়ণা। এই বনে বিশেষে ঋতুতে বিশেষ পুষ্প সমূহ শোভা বিস্তার করে। যেমন- — বসন্ত ঋতু জাত মাধবী ও বকুলাদি, গ্রীষ্ম ঋতু জাত মল্লিকা, পাটল ও শিরিষ, বর্ষা ঋতু জাত যুথিকা ও কেতকী, শরৎ ঋতু জাত জাতি, পদ্ম ও বান, হেমন্ত ঋতু জাত লোধ ও অম্লান এবং শিশির ঋতু জাত বন্ধুকাদি পুষ্পে বিরচিত বেশ রচনাই যার অঙ্গ ভূষণ সেই বৃন্দাটবী শোভিত হয়েছে।

এই বৃন্দাবনে কোথাও ভ্রমরের সাথে কোকিল গণ, কোথাও চাষ পাখীর সাথে ফিঙ্গরাজ, কোথাও ডাহুকের সাথে ময়ূর ও চাতকগণ, কোথাও সারসের সাথে হংসগণ, কোথাও স্বর্ণ চাতকের সাথে শুকগণ, কোথাও ভরদ্বাজ পাখীর সাথে হারীত পাখীগণ আনন্দে প্রেমপরবশ হয়ে তোমাদের উভয়ের গুণ ও যশঃ কীর্তন করছে।

শ্রীবৃন্দাদেবী কর্তৃক প্রদর্শিত বৃন্দাবনের এ প্রকার বহু শোভা সকল দর্শন করে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বৃন্দাদেবীকে হার যুগল পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করলেন। আর বৃন্দাদেবী রচিত বৃন্দাবনের শোভা সকলের প্রশংসা করতে লাগলেন।

(ঘ) হিন্দোল লীলায় শ্রীবৃন্দাদেবীর ভূমিকা ঃ—

শ্রীবৃন্দাদেবী কর্তৃক পরিচালিত শ্রাবণী শুক্লপক্ষের ঝুলন লীলা সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর রচিত "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত" গ্রন্থে একাদশ সর্গে বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত ঝুলনের বিশেষ বর্ণনা আছে। রাধাকৃষ্ণ যখন কুঞ্জ হতে বের হলেন তখন

শ্রীমতী বৃন্দাদেবী বললেন-"হে রসিক যুগল! এই পথে চল" বলে পথ দেখিয়ে দিলেন। রাধাকৃষ্ণ পথ চলতে চলতে "বর্ষাহর্ষ" নামে বন ভাগে উপস্থিত হলেন। তখন তারা বর্ষাকালীন বহু বিচিত্র শোভা দর্শন করলেন। সুগন্ধি ফুলের আস্তরণ যুক্ত অপূর্ব শোভায় শোভিত পতাকা যুক্ত একখানি হিন্দোলা দেখে তাতে রাধাকৃষ্ণ আনন্দে উপবেশন করলেন। দুই দিকে দুই প্রাণ সখী হিন্দোলা দোলাতে লাগলেন। অন্য দুই সখী দুটি তাম্বুল বীটিকা নিয়ে অবকাশ মত রাধাকৃষ্ণকে প্রদান করলেন। হিন্দোল উৎসবে আনন্দিত হয়ে সখীগণ রাধাকৃষ্ণের উপর পরাগ বৃষ্টি করলেন। গগন মন্ডলে দেবীগণ রাধা- কৃষ্ণের ঝুলন লীলা দর্শনকরে আনন্দে তাঁরা পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন। বিভিন্ন বৈচিত্রে হিন্দোলা সঞ্চালিত হতে লাগল। এক সময় হিন্দোলা শ্রীকৃষ্ণ বেগে দোলাতে লাগলেন। রাধারানী ভীতা হয়ে চক্ষু মুদ্রিত করলেন। এ দৃশ্যে কোন প্রাণসখী কৌশলে হিন্দোলা নীচ থেকে ধারণ করে দোলা বেগ আস্তে আস্তে স্থগিত করলেন। তারপর রাধারাণী দোলা হতে নীচে নামলেন। অনন্তর ললিতাদি সমস্ত সখীগণ দোলায় শ্রীকৃষ্ণের সাথে আন্দোলিত হলেন। একই সময় শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্যক হিন্দোলায় রাস-লীলার ন্যায় বহু মূর্তি ধারণ করে সকল সখীর সাথে আন্দোলিত হলেন।

তারপর অন্য এক খানি কমলাকৃতি হিন্দোলায় শ্রীকৃষ্ণ সখীগণের সহিত আরোহণ করলেন। কর্ণিকা স্থলে রাধাকৃষ্ণ, অষ্টদলে অষ্ট সখী এবং ষোড়শ দলে ষোলজন সখী উপবেশন করলেন। শ্রীমতী বৃন্দাদেবী তখন পরমানন্দে সকলকে অমৃত- পানক প্রদান করলেন।—

"একং তত্রৈবাস্তি হিন্দোলনাজং
বৃন্দেদ্দিষ্টং প্রেয়সীভি মুকুন্দঃ।"——
"বৃন্দানীত- স্বাদু খর্জ্জুর-জম্বু

দ্রাক্ষাঃ প্রাশ্নন্ কান্তভূক্তাবশিষ্টাঃ।"—
"নান্দীবৃন্দে বিন্দতঃ স্ম প্রমোদম্।"—

অনুবাদঃ—শ্রীবৃন্দাদেবী কমলাকৃতি একখানা হিন্দোলা দেখিয়ে দিবা মাত্রই এই গোপী গণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ তদুপরি আরোহণ করলেন। তখন শ্রীবৃন্দাদেবী পরমানন্দে,

খেজুর, জম্বুফল, দ্রাক্ষা ইত্যাদি নানাবিধ ফল ভোজনের জন্য প্রদান করলেন। ভোজনা বসানে বৃন্দাদেবী স্বর্ণকান্তি তাম্বুল বীটিকা প্রদান করলেন। তারপর বৃন্দাদেবী ও নান্দীমুখী- দুই দিক থেকে দুই জনে হিন্দোলা আন্দোলিত করতে লাগলেন। অন্যান্য সখীগণ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বিভিন্ন সঙ্গীত পরিবেশন করতে লাগলেন। এই হিন্দোলা অনুষ্ঠানে সকলেই পরমানন্দ লাভ করলেন। বৈষ্ণব পদকর্তা "রায় শেখর রাধাকুণ্ড তটে বৃন্দাদেবী রচিত ঝুলন অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন।—

"কানন দেবতী বৃন্দাসখী তথি
রাইয়ের সরসী কূলে।
বিচিত্র ঝুলনা করিল রচনা
সুখদ বকুল মূলে।।
ঝুলনা উপরি নাগর নাগরি
আসিয়া বসিল রঙ্গে।
ঝুলায় ঝুলনা সকল ললনা
ভাবে গদ্ গদ্ অঙ্গে।।
....
সহচরীগণ ঝুলায় দ্বিগুণ
সুস্বরে পঞ্চম গায়।
ঝুলনা ধরিয়া মধুর করিয়া
কহরে শেখর রায়।।
দেবতা পূজিতে চলহ ত্বরিতে
দিবস বহিয়া যায়।।"

এ ভাবে শ্রীমতী বৃন্দাদেবী ব্রজে ঝুলন লীলার অনুষ্ঠান সম্পাদনা করেন।

(ঙ) শ্রীবৃন্দাদেবী কর্তৃক বসন্তোৎসব ঃ—

বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীমতী বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন

যথাযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখেন। ঋতুরাজ বসন্তের আগমন ধ্বনি লক্ষ্য করে বৃন্দাদেবী বসন্তোৎসবের অনুষ্ঠান করার জন্য উৎকণ্ঠিতা হলেন। "আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ" এবং গোবিন্দলীলামৃতে "বসন্তোৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীযুগলের প্রীতি বিধানের জন্য বৃন্দাদেবী বসন্ত ঋতুর শোভা সম্ভারে বৃন্দাবনকে শোভিত করে রেখেছেন।—

"বৃন্দাদিভিঃ সরভসং বনদেবতাভিঃ
প্রীত্যাদরেন মহতা ভূপ গম্যমানাঃ।
কামং বসন্তমহ মঙ্গল বেষবাসো
ভূষাদিভির্বিদধিরে পরিভূষিতাস্তাঃ।।"

অনুবাদঃ— বৃন্দাদি বনদেবীগণ পরম প্রীতি ও আদর সহকারে সসখী রাধাকৃষ্ণকে বসন্তোৎসব জনিত মঙ্গল বেষ ভূষাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করেছিলেন।

" অথাহ বৃন্দা ব্রজমঙ্গলা করা
বালেপ- চিত্রে রুচিরাং সুবিস্তৃতাম্।
বসন্ত লীলোৎসব- রঙ্গবেদিকা
স্থলীমিমাং পশ্যতমগ্রতঃ স্থিতাম্।।"

অনুবাদঃ— বৃন্দাদেবী বললেন- হে ব্রজমঙ্গলাকর রাধাকৃষ্ণ! তোমরা অগুরু আদি সকলের নানাবিধ চিত্র দ্বারা বসন্তোৎবের রঙ্গ বেদিকা দর্শন কর। এই বৃন্দাবনে মাধবী, লবঙ্গল তাদি পরিবেষ্টিত হয়ে শোভিত ও মুকুলিত হচ্ছে রসাল বৃক্ষ সমূহ রক্তাশোক, নাগ কেশর, মন্দার, বকুলাদি বৃক্ষের এবং কনকলতা, নবমল্লিকা প্রকৃতি লতাবলীর প্রফুল্লিত কুসুম সৌরভে দিগন্ত আমোদিত। রসাল মুকুল ভক্ষণে কোকিলের পঞ্চম তান স্পষ্টতর। ভৃঙ্গ সমূহ সমাচ্ছন্ন, মকরন্দ রসধারায় সিক্ত, কস্তুরী মৃগের মদমদে বনভূমি সুবাসিত। শ্রীমতী রাধারাণী সখীগণ সঙ্গে পরিবৃত্তা হয়ে মাধবী মণ্ডপে উপবেশন করলেন- যেন মূর্তিমতী বসন্ত লক্ষ্মী।

স্বয়ং শ্রীমতী বৃন্দাদেবী রাধারাণীকে বিভিন্নালঙ্কারে বিভূষিত করতে লাগলেন। সযত্নে বৃন্দাদেবী রাধারাণীকে অরুণ বস্ত্র পরিধান করালেন। সর্বাঙ্গে চতুঃসমচর্চা, ললাটে কামযন্ত্র তিলক, চিবুকে কস্তুরী বিন্দু অঙ্কন করলেন। নাগকেশর কুসুম দ্বারা বেণী বন্ধন, কেশ কুসুমিত করণ, চূর্ণ কুন্তলে বকুল পুষ্পমাল্য, গণ্ডে পত্রাবলী, নয়নে কজ্জল, নাসাগ্রে মুক্তা, কর্ণে আম্র মুকুলের অবতংস, বদনে তাম্বুল, পদতলে যাবক, দক্ষিণহাতে লীলা কমল প্রদান,সীমন্তে মণি খচিত স্বর্ণচূড়া, ললাট ফলকে ললাটিকা, কর্ণে কুন্ডল, কটিতটে কাঞ্চী, চরণে নুপুর, পদাঙ্গুলীতে রত্নাঙ্গুরীয়ক, বাহুতে স্বর্ণাঙ্গদ, মনিবন্ধে বলয়, করাঙ্গুলীতে স্বর্ণাঙ্গুলীয়ক, গলে মুক্তাহার ইত্যাদি আভরণে বিভূষিতা করলেন। অন্যান্য বনদেবীগণ অন্যান্য সখীদের বিভিন্ন অলঙ্কারে ভূষিতা করলেন। আবীর, মৃগমদপঙ্ক, কুসুম ধনু, কুসুম বান, রত্নময় জলযন্ত্র ইত্যাদি বৃন্দাদেবীর আদেশে যথা স্থানে সজ্জিত করা হলো।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবী দূর হতে উৎসব মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখে উল্লাসিত হয়ে বললেন,- হে রাধে! তোমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ পরিবেষ্টিত হয়ে বসন্তোৎসবকে মূর্তিমান করে নৃত্য- গীত- বাদ্যাদি সহ এদিকে আগমন করছেন। তাঁর মস্তকের বামদিকে হেলানো শুভ্র উষ্ণীষ, তন্মধ্যে পুন্নাগ কুসুমের স্তবক,তদুপরি ময়ূর পুচ্ছ। কেশে মাধবী পুষ্পের মালা, অঙ্গে পীত বর্ণের জামা, কটীতটে কাঞ্চী, পদাম্বুজে শব্দায়মান নূপুর বাম করে বেণু, দক্ষিণ করে সিন্দুর কন্দুক আন্দোলন করছে। স্বর্ণ বর্ণ তাম্বুল বীটিকা প্রিয় সখার কর কমল থেকে গ্রহণ করছে। সখাগণ কতৃক উৎক্ষিপ্যমান অরুণ বর্ণ আবীর সমূহ হাল্কা হেতু আকাশে ঘুরছে, তোমার প্রাণনাথের চূড়া, তিলক অলকাদি স্পর্শ করতে পারছেনা। সপ্তস্বরে সমুজ্জ্বল করে বসন্তরাগ গান করতে করতে নৃত্যরত অবস্থায় এদিকে আসছে।

বৈষ্ণব পদকর্তা বৃন্দাদেবী পরিচালিত বসন্ত বিহারের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। যথা —

"সময় জনিয়া তব শ্রীবৃন্দাদেবী।
ইঙ্গিতে বনহু বসন্তহি সেবি।।

গন্ধ চূর্ণ বহু আনল তাই।
সব সখীগণ মেলি লেওল ধাই।।
মানিয়া কতশত পিচকারী আনি।
পূরল তাহে কুসুম গেণ্ডু - চন্দন- পানি।।
এক এক করি সব সহচরী নেল।
শত শত কুসুম- গেণ্ড পুনঃ দেল।।
কুসুমক বারি ঝারি ভরি আনি।
তাহে মিশায়ল মৃগমদ পানি।।
পিচকারী ভরি কানু তাহা নেল।
হেরইতে মাধব হরষিত ভেল।।”—

।। বসন্তরাগ।।

হোলির প্রকার যৈছে করে তৈছে লীলা।
বহু গন্ধ চূর্ণ বস্ত্র অঞ্চলে বান্ধিলা।।
কিঙ্কিনী শৃঙ্খল দিয়া করিলা বন্ধন।
আরম্ভ করিল গীত কাম উদ্দীপন।।
সবে গন্ধ চূর্ণ দেই কৃষ্ণের উপরে।
পুষ্পের কন্দুক লইয়া কেহ কেহ ডারে।।
মণিময় পিচকারী ধরি সখীগণে।
পুষ্প গন্ধজলে তাহা করিয়া পূরণে।।
সবেমিলে সিঞ্চয়ে গোবিন্দ কলেবর।
সুবল মধুমঙ্গল কৃষ্ণ সহচর।।
খেলিতে খেলিতে সবে হইলা বিভোল।
কহয়ে মাধব অতি সুমধুর বোল।।

।। সিন্ধুরা।।

আবিরে অরুণ সব বৃন্দাবন
উড়িয়া গগন ছায়।
বন্ধুয়া হিয়ার হিয়ার মাঝারে
কেহ না দেখিতে পায়।।
চপল নয়ন পিচকারি যেন
নিরখে নয়ন মোর।
নব অনুরাগে ফাগু ভরল
তনু মন করি জোর।।
শুধুই শ্যামল অঙ্গ পরিমল
চন্দন চূয়াক ভাতি।
মোর নাসাজনু ভ্রমরী উমতি
ততহি পড়ল মাতি।।
নয়নে নয়নে বয়নে বয়নে
হৃদয়ে হৃদয়ে মেলি।
দুই কলেবর অরুণ অম্বর
ঝাপিয়া করল কেলি।।
রসিক নাগর রসের সাগর
করল ঐছন কাজ।
এ উদ্ধব ভন চতুর দুজনে
রসবতী রসরাজ।।

শ্রীমতী বৃন্দাদেবী বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্য এভাবে বসন্তোৎসবে হোলি লীলার অনুষ্ঠান করেন।

(চ) শ্রীবৃন্দাদেবী কর্তৃক মধুপান লীলার অনুষ্ঠান ঃ—

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর “শ্রী শ্রী কৃষ্ণভাবনামৃত” গ্রন্থে ত্রয়োদশ সর্গে সসখী

রাধা- মাধবের মধুপান লীলার অনুষ্ঠানের বর্ণনা করেছেন। সসখী রাধা মাধবের বন ভ্রমন জনিত ক্লান্তি দূর করার জন্য শ্রীমতী বৃন্দাদেবী মধুপানের আয়োজন করেছেন। শ্রীমতী রাধারাণী রজত পাত্রে নিহিত মধুর উপরি নয়ন বিধান করে- এই মধু কতই সুন্দর, এ কথা বলে তথায় প্রিয়তমের মুখ প্রতিবিম্ব দেখতে লাগলেন। মধু অপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মুখ- সুধা অধিক স্বাদ্বীরূপে বিবেচনা করে তৃষ্ণার সহিত সম্পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা পান করতে লাগলেন। মনে মনে বিধাতাকে বললেন, হে বিধাতঃ! যাদের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ উৎকণ্ঠার অনলে মন দগ্ধ হচ্ছে সেই ব্রজ গোপীদের সম্বন্ধে লজ্জা সৃষ্টি করে কতবার যে অভিসম্পাত ভাজন হয়েছ, অর্থাৎ দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের দৃষ্টি পথে এলেও লজ্জাবশতঃ সম্পূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণ বদন দেখতে পারিনি বলে তোমার কত অভিসম্পাত করেছি! কিন্তু তুমি যে মধু সৃষ্টি করেছ তাতে শ্রীকৃষ্ণ মুখ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় এখন আমরা তা অবাধে দেখে পরমানন্দ লাভ করছি। হে বিধে! তোমার শত শত বার প্রণাম করি।

তারপর রজত পাত্রস্থিত মধুতে যে নিজমুখ প্রতি বিম্বিত হয়েছে তাতে শ্রীরাধা মুখ প্রতিবিম্বিত দেখে শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে সখি রাধে! এখন তুমি বল পূর্বক আমার বদন কমল পান করছ। জানিনা মধু পান করলে কি করবে? এর পর শ্রীকৃষ্ণ রাধা-ললিতাদি সকলকেই মধুপান করালেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর "শ্রীশ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে" চতুর্দ্দশ সর্গে মধুপান লীলার বর্ণনা করেছেন। ললিতানন্দ কুঞ্জে শ্রীমতী বৃন্দাদেবী ...গোবিন্দকে মধুপান করিয়ে তাঁদের আনন্দ বিধান করেন।—

"গত শ্রমেঽস্মিন্ সগণে সখীভিঃ
পাদাব্জ-সম্বাহন- বীজনাদ্যৈঃ।
মাধ্বীক পূর্ণ চষকং পুরস্তাৎ
তয়োঃ সমানীয় দধার বৃন্দা।।"

অনুবাদঃ— সখীগণ রাধাকৃষ্ণের বন ভ্রমন জনিত শ্রম চামর বীজন করে দূর

করলেন। তারপর শ্রীমতী বৃন্দাদেবী মধুপূর্ণ পান পাত্র এনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে স্থাপন করলেন। রাধাকৃষ্ণ ঐপান পাত্রে নেত্রপাত করলে তাদের প্রতিবিম্ব পতিত হয়ে একটি কনক কমল ও একটি নীল কমল বলে তাঁদের মনে হলো। কুন্দলতা তাদের মধুপান করতে বললেন। শ্রীকৃষ্ণ মধু পানের জন্য রাধিকার হাতে দিলেন। শ্রীরাধা তা আঘ্রাণ পূর্বক অধর স্পর্শ করে শ্রীকৃষ্ণের হাতে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তা পান করে আবার রাধার হাতে দিলেন রাধারাণী তা পান করলেন শ্রীমতী বৃন্দাদেবী পানাবশিষ্ট মধুতে অন্য মধু মিশিয়ে বহু পাত্রে ঢেলে সমস্ত সখীদের প্রদান করলেন। বৃন্দাদেবী সখীদের সম্মুখে মধুপাত্র প্রদান করলে শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক বিদ্যা দ্বারা সমস্ত সখীদের পার্শ্বে রাসলীলার ন্যায় বর্তমান থাকলেন। সমস্ত সখীগণ প্রত্যেকেই দেখলেন যে, আপন আপন পার্শ্বে আগত শ্রীকৃষ্ণ তাদের মধুপান করিয়ে নিজেও মধুপান করছেন। এ ভাবে সকলেই মধুপান করে মত্ততা বশতঃ উদ্‌ভ্রান্ত লোচনা ও অত্যন্ত বিহ্বলা হয়ে প্রলাপ করতে লাগলেন। সকলেই মধুপান জনিত মত্ততার পরবশ হয়েছিল। তারপর তাম্বুল ও চন্দনাদি গন্ধ ও সুরভিত জলপূর্ণ পাত্র সমূহে সুশোভিত কুঞ্জ মধ্যে শয্যায় গিয়ে সকলে শয়ন করলেন। এ ভাবে শ্রীমতী বৃন্দাদেবী মধুপান লীলার অনুষ্ঠান করেন।

(ছ) শ্রীবৃন্দাদেবী বাক্‌ভঙ্গীতে সুনিপুণা ঃ—

শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর দৌত্য চাতুর্য অতি অপূর্ব। দূতী বৃন্দা বাক্ নৈপুণ্যে প্রিয়গণের প্রতি মিলন অনুরাগ জাগিয়ে তুলেন।—

"দূতীর প্রধান সেই বৃন্দা ঠাকুরানী।
কৃষ্ণ প্রিয়গণের সে সুপ্রিয় বাদিনী।।
ব্রজের মোহিনী বরা হয় বৃন্দাদূতী।
শ্রীমতী রাধার সনে সতত বসতী।।"

শ্রীমতী রাধারাণী সখীগণ সাথে শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলনের জন্য কুঞ্জের দিকে চলেছেন। শ্রীকৃষ্ণও মিলন আশায় কুঞ্জের সন্নিকটে অবস্থান করছেন। শ্রীমতী রাধার

অঙ্গ গন্ধে বন আমোদিত হওয়ায় শ্রীমতী রাধারাণীকে আনয়নের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে পাঠালেন। শ্রীবৃন্দার দর্শনে শ্রীরাধার সংলাপ —

"কস্মাৎ বৃন্দে —

শ্রীরাধা বললেন- বৃন্দে! তুমি কোথা হতে এলে?

"প্রিয় সখি। হরেঃ পাদমূলাৎ"

বৃন্দা বললেন- প্রিয় সখি! শ্রীকৃষ্ণ পাদমূল হতে।

"কুতোঽসৌ"—রাধা বললেন — তিনি কোথায়?

"কুণ্ডারণ্যে"

"বৃন্দা" বললেন- তোমার কুণ্ডতীরবর্তী কাননে।

"কিমিহ কুরুতে? — রাধা বললেন — সেখানে কি করেন।

"নৃত্যশিক্ষাং"— বৃন্দা বললেন — নৃত্য শিক্ষা করেন।

"গুরুঃ কঃ"

রাধা বললেন- নৃত্য শিক্ষার গুরু কে?

" ত্বং ত্বন্মূর্তিঃ প্রতি তরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী শৈলুষীব ভ্রমতি পরিতো নওয়ন্ত্রী স্বপশ্চাৎ।।"

শ্রীবৃন্দা বললেন — তোমার মূর্তি প্রতিলতায় তরুতে নটীর ন্যায় স্ফুর্তি শীলা হয়ে আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁকে নিত্য শিক্ষা করান। এই প্রকার উত্তম বাক্‌নৈপুণ্য দ্বারা বৃন্দাদেবী সখীগণ পরিবৃত হয়ে রাধা মাধবের লীলা মাধুরী বিস্তার করেন।

(জ) শ্রীকৃষ্ণের দূতীরূপে বৃন্দাদেবী ঃ—

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত "নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এক সময় শ্রীকৃষ্ণ ধীর সমীরে উপস্থিত হয়ে রাধারাণীর সাথে মিলনের জন্য নিজ মনোভাব বৃন্দাদেবীর নিকট ব্যক্ত করলেন।—

"কৃষ্ণ কহে শুন বৃন্দে কহি যে তোমারে।

কিরূপে রাধিকা আসি মিলিবে আমারে।।"—

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাদেবীকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন রাধিকাকে ধীর সমীরে অতি শীঘ্রই নিয়ে আসে। রাধিকা বিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের বেদনা অনুভূতির কথা বৃন্দাদেবী গিয়ে রাধারানীর কাছে ব্যক্ত করলেন। —

" কৃষ্ণের বিলাপ ঐছে বৃন্দাদেবী শুনি।
রাধিকা নিকটে শীঘ্র গেলেন আপনি।।
অত্যন্ত ব্যাকুলা বৃন্দাদেবীরে দেখিয়া।
কারণ জিজ্ঞাসে রাই স্নিগ্ধতা করিয়া।।
তবে বৃন্দাদেবী অতি কাতর অন্তরে।
কৃষ্ণের বৃত্তান্ত সব কহেন রাধারে।।"

শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ ও ব্যাকুলতার কথা শুনে রাধারানী প্রায় অচেতন হয়ে পড়লেন। সখীরা সেবাদি করার পর রাধারাণীর চেতনা স্বাভাবিক হলে বৃন্দাদেবী রাধারানীকে বললেন অভিসার করতে। বৃন্দা বললেন- হে রাধে! তোমার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ধীর সমীরে অপেক্ষায় আছেন। যমুনার তীরে সেখানে সুগন্ধ সমীরণ ধীরে বইছে। শ্রীকৃষ্ণের বেণুতে সমীর স্পর্শে "রাধা, রাধা" ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। বৃন্দাদেবী আবার বললেন—

" তোমারে লইতে আমায় পাঠাইয়া দিল।
হের দেখ অর্দ্ধ নিশা অতীত হইল।।
অতএব রাই তুমি আমার বচন।
শুনিয়া ত্বরিতে বেষ করহ রচন।।"—

অতপর ললিতাদি সখীগণ রাধারাণীকে বিভিন্ন বেষ ভূষায় সজ্জিত করলেন। তারপর রাধারাণী—

"কৃষ্ণ প্রেমে বিনোদিনী নিকুঞ্জ ভবনে।
গমন করিল সুখে সখীগণ সনে।।

অতি আর্ত হৈয়া কুঞ্জে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
'রাধা' 'রাধা' বলি বেণু পুরে অনুক্ষণ।।
সে ধ্বনি শুনিয়া প্রেমে বৃষভানুসুতে।
ত্বরিতে চলয়ে বৃন্দাদেবীর সহিতে।।
অনুরাগ চিত্তে ধীর সমীরে আইল।
কুঞ্জের ভিতরে কৃষ্ণ দর্শন পাইল।।
নানা ভাব বিকার হইল কৃষ্ণ অঙ্গে।
চন্দ্র দর্শনে যেন জলধি তরঙ্গে।।"—

শ্রীমতী রাধারানী অতি শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তারে দেখে পরম স্নেহে সম্ভাষণ করলেন। তারপর—

"সখীগণ দুই জনে বেড়িয়া বসিল।
নানাহাস পরিহাস করিতে লাগিল।।
অতি রসাবেশে দোঁহে মন্দ মন্দ হাঁসে।
দেখি সখীগণ চিত্তে বাড়য়ে উল্লাসে।।
তবে তাহা হৈতে উঠি সকৌতুক মনে।
কুঞ্জ শোভা দেখিয়া বুলয়ে স্থানে স্থানে।।
আশে পাশে বেড়িয়া চলয়ে সখীগণে।
মধ্যে রাধা কৃষ্ণ চলে সহাস্য বদনে।।
কেহ কুঞ্জ হৈতে আনে পুষ্পাদি তুলিয়া।
দুহুঁ অঙ্গে ফুলদেয় অঞ্জলী ভরিয়া।।
কেহ রাই পাশে রহি আনন্দিত চিতে।
তাম্বুলের বীড়া তুলি দেয় রাই হাতে।।
বীড়া হাতে লই রাই আনন্দিত মনে।
যতন করিয়া দেয় কৃষ্ণের বদনে।।

কৃষ্ণ তৈছে সখীস্থান হৈতে বীড়া লৈয়া।
রাইব বদনে দেয় মহাসুখ পাইয়া।।
পুনঃ সবে সেই কুঞ্জে আসিয়া বসিল।
বৃন্দাদেবী নানা ভক্ষ্য দ্রব্যাদি আনিল।।
বৃন্দাদেবী নানান্ দ্রব্যাদি কৃষ্ণ আগে।
পারশ করিল অতিশয় অনুরাগে।।
গৃহ হৈতে রাই যে উপহার আনিল।
আনন্দ হৃদয়ে সখী দুহুঁ আগে দিল।।
রাধা কৃষ্ণ দোঁহে অতি আনন্দিত মনে।
ভক্ষণ করিয়া সুখে করি আচমনে।।
তবে দোঁহে কুঞ্জ শয্যা উপরে বসিল।
সখীগণ শেষাধরামৃত আস্বাদিল।।

এভাবে শ্রী বৃন্দাদেবীর প্রচেষ্টায় রাধাকৃষ্ণ মিলিত হয়ে সখীগণ সহ নানা কৌতুক পূর্ণ আলোচনার পরে ভোজনাদি সম্পন্ন করে সকলেই নিজ নিজ কুঞ্জে শয়ন করলেন।

(ঝ) শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণের পত্নীকি - না?

এক সময় শ্রীমতী রাধারাণী হাস্যবদনে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন- হে কৃষ্ণ! বিবাহ যোগ্যা বহু কন্যা সমন্বিত এই ব্রজে তুমি সদ্ গুণে পূজ্য তরুণ বয়স্ক রাজপুত্র। তথাপি তোমার যখন বিবাহ হয় নি তখন বুঝা যায় তুমি ধৃত নিয়মে ব্রহ্মচারী। তোমার এত মহৎ গুণ শ্রবণ করে কোন কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করে নি। বিবাহ না হওয়ার জন্য তুমি "তুরঙ্গ- ব্রহ্মচারী" তাই তুমি স্বভাব সিদ্ধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করছ। তুমি যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হও, তা হলে পরস্ত্রীর মুখ দর্শনে এত আগ্রহ কেন? হে ব্রহ্মচারিন্! স্ত্রীগণের এই পুষ্পবনে তোমার কোন কার্য নেই, তুমি পশু চারণের নিমিত্ত তৃণ যুক্ত স্থানে চলে যাও। কি আশ্চর্য! তুমি এই বনে পুষ্পাদি বৃক্ষের একটি মাত্রও রোপণ করনি অথচ বনের অধিকারী, অধিকন্তু গোচারণ দ্বারা পুষ্প তরু সকল নির্মূল করলে, তথাপি তুমি বনের রক্ষক, সত্য বটে? এই বন আমাদের সখী বৃন্দা কর্তৃক পরিবর্ধিত

হওয়ায় বৃন্দাবন বলে বিখ্যাত। আমায় রাজ্যাভিষেক করে বৃন্দাদেবী আমাকে এই বন সমর্পণ করেছে, — এ কথাসুপ্রসিদ্ধ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন ওহে! শত শত লক্ষ্মী অপেক্ষাও মধুর এই বৃন্দা আমারই পত্নী, যদি বিশ্বাস না হয়, নিভৃতে তাকে জিজ্ঞাসা কর।"ইয়ং লক্ষ্মী বৃন্দাদপি মধুর বৃন্দা মম বধূ ভবেৎ।" বেদে স্ত্রী পুরুষের ভেদ নেই। পরন্তু অর্ধঙ্গ বলে কীর্তিত। আমাদের দুজনের নামেই তো বন- সকলেই একথা বলেন।

শ্রীরাধিকা এ কথা শুনে মৃদুমন্দ স্বরে বৃন্দাকে বললেন- "হে বৃন্দে! ইহা সত্য বটে কি- না? তুমি প্রিয়গণের সমীপে এ কথা বলতে লজ্জিত কেন? বৃন্দাদেবী এ কথা শুনে কোপ প্রকাশ করে চঞ্চল ও ভ্রূভঙ্গি পূর্বক কুটিল স্বভাবা সখী দিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন- হে কৃষ্ণ! তুমি পদ্মা নাম্নী চন্দ্রাবলীর ষণ্ড, তুমি যদি ব্রজের আধিপত্য ইচ্ছা কর, তবে চন্দ্রাবলীকে ভজনা কর। তবে তিনি তোমায় বিলাস বনের আধিপত্য প্রদান করবে।

অষ্টম স্তবক
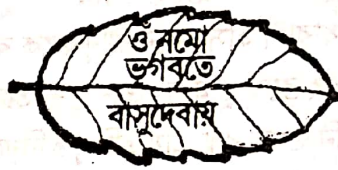
।। শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্ ।।

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যৈ নমঃ।

গাঙ্গেয়- চাম্পেয়- তড়িদ্‌বিনিন্দি-
রোচিঃ- প্রবাহ- স্নপিতাত্মবৃন্দে।।
বন্ধূক- রন্ধু- দ্যুতি- দিব্যবাসো
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দং।। ১।।
বিম্বাধরোদিত্বর- মন্দহাস্য-
নাসাগ্র- মুক্তাদ্যুতি- দীপিতাস্যে।।
বিচিত্র- রত্নাভরণাশ্রিয়াঢ্যে!
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দং।। ২।।
সমস্ত- বৈকুণ্ঠ- শিরোমণৌ শ্রী-
কৃষ্ণস্য বৃন্দাবন- ধন্য- ধাম্নি।
দত্তাধিকারে বৃষভানু- পুত্র্যা
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দং।।৩।।
ত্বয়াজ্ঞয়া পল্লব- পুষ্প- ভৃঙ্গ-
মৃগাদিভির্মাধব- কেলিকুঞ্জাঃ।
মধ্বাদিভির্ভান্তি বিভূষ্যমাণা
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দং।। ৪।।
ত্বদীয়- দূত্যেন নিকুঞ্জ- যুনো-
রত্যুৎকয়োঃ কেলি- বিলাস- সিদ্ধিঃ।
ত্বৎ- সৌভগং কেন নিরুচ্যতাং তদ্

বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দং।।৫।।
রাসাভিলাষো বসতিশ্চ বৃন্দা-
বনে ত্বদীশাঙ্ঘ্রি- সরোজ- সেবা।
লভ্যাচ পুংসাং কৃপয়া তবৈব
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দং।।৬।।
ত্বং কীর্ত্ত্যসে সাত্বত- তন্ত্রবিদ্ভি-
লীলাবিধানা কিল কৃষ্ণ- শক্তিঃ।
তবৈব মূর্ত্তিস্তুলসী নৃলোকে
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দং।।৭।।
ভক্ত্যা বিহীনা অপরাধ- লক্ষৈঃ
ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি- তরঙ্গ- মধ্যে।
কৃপাময়ি! ত্বাং শরণং প্রপন্না
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দং।।৮।।
বৃন্দাষ্টকং যঃ শৃণুয়াৎ পঠেদ্ বা
বৃন্দাবনাধীশ- পদাব্জ- ভৃঙ্গঃ।
স প্রাপ্য বৃন্দাবন- নিত্যবাসং
তৎ- প্রেমসেবাং লভতে কৃতার্থঃ।।৯।।

ইতি শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি- ঠাকুর-বিরচিত-স্তবামৃতলহর্য্যাং শ্রীশ্রী বৃন্দাদেব্যষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকের অনুবাদ

হে অত্যুজ্জ্বল-রক্তবর্ণ- বসন- ধারিণী বৃন্দে! তুমি স্বীয় পরম সুন্দর অঙ্গ- কান্তি দ্বারা স্বর্ণ, চম্পকপুষ্প ও সৌদামিনীকেও তিরস্কার কর এবং তদ্দারা স্বজনগণ অর্থাৎ

শ্রীশ্রীতুলসী দেবী

কৃষ্ণভক্তগণকে অভিষিক্ত কর; তোমার শ্রীচরণারবিন্দে নমস্কার করি।।১।।

হে বৃন্দে! তোমার বিম্ব-সদৃশ রক্তবর্ণ অধরোদগত মৃদু-মধুর হাস্য ও নাসিকাগ্রবর্ত্তী মুক্তা- কান্তি দ্বারা ত্বদীয় বদন-মণ্ডল পরিশোভিত হয়েছে এবং তুমি বিচিত্র রত্নাভরণে সৌন্দর্য্যান্বিতা হয়েছ; তোমার শ্রীচরণ-পদ্মে নমস্কার করি।।২।।

হে বৃন্দে! বৃষভানুরাজ- নন্দিনী শ্রীরাধিকা নিখিল-বৈকুণ্ঠ- সমূহের শিরোমণি ও অশেষ- গুণ- সমন্বিত পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ- ধাম শ্রীবৃন্দাবনে তোমাকে অধিকার- প্রদান করেছেন; তোমার শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার করি।।৩।।

হে বৃন্দে! তোমারই আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে পত্র, পুষ্প, ভ্রমর, মৃগ. ময়ূর শুক-সারী প্রভৃতি পশু-পক্ষীগণে ও চির- বসন্তে শ্রীকৃষ্ণের কেলিকুঞ্জ- সমূহ বিভূষিত হয়ে পরম শোভা পেতেছে; তোমার শ্রীপদারবিন্দে প্রণাম করি।।৪।।

হে বৃন্দে! তোমার দূতীত্বের চাতুর্য্য- প্রভাবেই বিলাস- বাসনাময়ী শ্রীরাধা কৃষ্ণের কেলি- বিলাস সম্পন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ তুমিই দূতীরূপে শ্রীরাধা গোবিন্দের সুদুর্ঘট মিলন সম্পাদন করিয়ে তাদের লীলা- বিলাসের সহায়তা করে থাক; অতএব এ সংসারে তোমার সৌভাগ্যের সীমা বর্ণনা করতে কে সক্ষম হবে? তোমার শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার করি।।৫।।

হে বৃন্দে! কৃষ্ণভক্তগণ তোমারই কৃপায় শ্রীরাসলীলা- দর্শনাভিলাষ শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও ত্বদীয় প্রাণবল্লভ শ্রীরাধা-মাধবের চরণ-সেবা লাভ করে থাকেন;তোমার শ্রীপদ- কমলে নমস্কার করি।।৬।।

হে বৃন্দে! শ্রীনারদাদি- ভক্তগণ- বিরচিত তন্ত্র- সমূহে সুনিপুণ পণ্ডিতগণ তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা- শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন এবং এই নরলোকে সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ- রূপিনী শ্রীতুলসীদেবী হলেন তোমারই মূর্ত্তি; তোমার শ্রীচরণ- পঙ্কজে অভিবাদন করি।।৭।।

হে কৃপাময়ি দেবি! আমরা ভক্তিহীন বলে শত শত অপরাধ প্রযুক্ত 'ভব-সমুদ্রের কাম- ক্রোধাদি-রূপ ভীষণ তরঙ্গ- মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি;-অতএব তোমার শরণাগত হলাম, তুমি কৃপা করে আমাদের এই সুদুস্তর ভব-জলধি হতে উদ্ধার কর; তোমার শ্রীচরণ- সরোজে নমস্কার করি।।৮।।

যে ব্যক্তি বৃন্দাবনাধিপতি রাধা গোবিন্দের চরণ কমলের ভৃঙ্গ স্বরূপ হয়ে শ্রীবৃন্দাদেবীর এই অষ্টক পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি বৃন্দাবনে নিত্য বাস প্রাপ্ত হয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম সেবা লাভ করে কৃতার্থ হন।। ৯।।

।। শ্রীবৃন্দা খণ্ড সমাপ্ত ।।

" বৃন্দাদেবী কবে মোরে বান্ধিয়া করুণা ডোরে,
আকর্ষিয়া লবে ব্রজপুরে।।"

— o —

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব

ওঁ তুলস্যৈ নমঃ

।। ২ ।। শ্রীতুলসী খণ্ড।।

প্রথম মঞ্জরী

তুলসী দেবীর তত্ত্ব পরিচয়

শ্রীমতী তুলসীদেবী শ্রীকৃষ্ণভক্তি জননী। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রদায়িনী, সর্বদুঃখহারিণী এবং শ্রীকৃষ্ণের সাথে মায়াবদ্ধ জীবের মিলনকারিণী। গোলোক বাসিনী শ্রীমতী তুলসীদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ প্রেয়সী। বৃহৎ ধর্ম পুরাণে বলা হয়েছে—শ্রীমতী তুলসীদেবী দ্বিভুজা, শ্যামাঙ্গী, চারুবদনী, শ্বেতবসনা, শঙ্খ-পদ্ম হস্ত যুক্তা এবং নানা প্রকার অলঙ্কারে বিভূষিতা। তিনি ভক্তের সর্বার্থ সিদ্ধি প্রদান করে থাকেন।

বৃক্ষ রূপে অবস্থিতা তুলসীদেবী বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকেন। যেমন—হরিৎ বর্ণ, কৃষ্ণ বর্ণ, সবুজ বর্ণের এবং কখনো মিশ্রিত বর্ণেরও দৃষ্ট হয়। বৃক্ষরূপে অবস্থিতা তুলসীদেবীর প্রতি পত্রে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র বিরাজমান। আবার প্রতি বর্ণে বা অক্ষরে ভগবান বিষ্ণুর সহস্র নাম বিরাজমান। এই মর্ত্য জগতে তুলসীদেবী কখনো শঙ্খচূড়ের পত্নীরূপে, কখনো জলন্ধরের পত্নীরূপে, কখনো ধর্মদেবের পত্নীরূপে কখনো বা ভগবান বিষ্ণুর নয়নাশ্রু থেকে আবির্ভূতা হয়েছেন। তিনি যখন যেভাবেই আবির্ভূতা হোক না কেন সর্বাবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণপরায়ণা ছিলেন। এই জগতে তার কোন তুলনা নেই। তাই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বলা হয়েছে— "পুষ্পেষু তুলনাপ্যস্যা নাসীদ্ দেবীষু বা মুনে। পবিত্র রূপা সর্বসু তুলসী সা চ কীর্ত্তিতা।।"

অর্থাৎ হে মুনে! সমস্ত পুষ্প সমূহের মধ্যে এবং সমস্ত দেবী গণের মধ্যে যাঁর কোন তুলনা নেই, সেই কারণে সমস্ত পুষ্প ও দেবীগণের মধ্যে পবিত্র রূপা এই দেবীকে তুলসী বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই তুলসী ব্যতীত কোন ভোগ্যবস্তুই গ্রহণ করেন না। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে—"ছাপান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন, বিনা তুলসী প্রভু একোনাহি মানি। এই ভাবে দেখা যায় শ্রীমতী তুলসী দেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়া অন্তরঙ্গা শক্তি।

দ্বিতীয় মঞ্জরী

ক) তুলসী দেবীর আবির্ভাব (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

শ্রীমতী তুলসী দেবীর আবির্ভাব সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তিনখানি পুরাণে উল্লিখিত শ্রীমতী তুলসী দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হবে। কেননা তুলসী দেবীর আবির্ভাব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে হয়েছে। প্রথমে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে "প্রকৃতি খণ্ডে" নারায়ণ-নারদ সংবাদ প্রসঙ্গে যে উপাখ্যান বর্ণিত আছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নারদ মুনি নারায়ণকে প্রশ্ন করলেন—হে প্রভো! সতী সাধ্বী তুলসী কিভাবে ভগবান নারায়ণকে পতি রূপে লাভ করলেন। তিনি কোন বংশে, কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন, কে তার পিতা, তিনি কেন অসুর কর্তৃক গ্রস্থা হন? —কৃপা করে আপনি এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। নারায়ণ বললেন—হে নারদ! দক্ষ সাবর্ণি নামে এক মনু ছিলেন। তাঁর পুত্র ধর্ম্ম সাবর্ণি। ধর্ম্ম সাবর্ণির পুত্র দেব সাবর্ণি তাঁর পুত্র বৃষধ্বজ। এই বৃষধ্বজ শিবের ভক্ত ছিলেন। তিনি ভগবান বিষ্ণুকে মানতেন না। তিনি বিষ্ণু পূজার নিন্দা করতেন এবং পূজা বন্ধ করে দেন। তার রাজ্য মধ্যে সমস্ত দেবতার পূজাই বন্ধ করে দেন। কোন দেবতাই শিবের ভয়ে তাকে অভিশাপ দিতে সাহসী হননি। কিন্তু এক সময় সূর্যদেব রাজা বৃষধ্বজকে "ভ্রষ্টশ্রীভব ভূপেতি"— হে রাজন! তুমি শ্রীভ্রষ্ট হও— এই বলে অভিশাপ প্রদান করেন। শিবের প্রিয়ভক্ত বৃষধ্বজকে সূর্যদেব শাপ প্রদান করায় শিব সূর্যের প্রতি ক্রোধান্বিত হন। শিব তখন ত্রিশূল নিয়ে সূর্যের প্রতি ধাবিত হলেন। সূর্যদেব পিতা কশ্যপের সহিত ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁদের নিয়ে বৈকুণ্ঠে ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। ভগবান বিষ্ণু তাদের অভয় প্রদান করেন। এদিকে শিব ও ত্রিশূল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন।

তখন ক্রোধে তাঁর নয়ন রক্ত বর্ণ ছিল। তিনি বিষ্ণুকে প্রণাম করে আসনে উপবেশন করেন। বিষ্ণু পার্ষদগণ শিবকে বীজন করে বায়ু দ্বারা সেবা করে তাকে বিশ্রাম সুখ প্রদান করলেন। বিষ্ণু ও বিষ্ণুপার্ষদগণের সংসর্গে শিব ক্রোধ শূন্য হয়ে শান্ত হলেন এবং ঈষৎ হাস্যময় পঞ্চবদনে ভগবান বিষ্ণুকে স্তব করলেন।

ভগবান বিষ্ণু বললেন—হে শঙ্কর! তুমি শিব অর্থাৎ কল্যাণময়, তোমার কল্যাণ জিজ্ঞাসা করা উপহাস জনক! তবে লোকাচার বশতঃ তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিছ। তুমি জ্ঞানের অধিশ্বর-সর্বজ্ঞ, তোমাকে জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞসা করাও বৃথা। তুমি সর্বদা মৃত্যুঞ্জয় হর আপদ শূন্য-নিরাপদ। " তোমার কোন বিপদ হয়নি তো"। ইত্যাদি রূপে তোমার বিপদ জিজ্ঞাসা করাও অনুচিত। তুমি তোমার আশ্রয়েই এসেছ। অতএব তোমাকে আগমন প্রশ্ন করাও চলে না। কেবল এই জিজ্ঞসা করি যে, তোমাকে দেখে মনে হয় যে, তুমি খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছ। —এর কারণ কি? বল। শিব বললেন—ভগবান! রাজা বৃষধ্বজ আমার ভক্ত। সূর্য তাকে অভিশাপ দান করেছে। এটাই আমার ত্রাসের কারণ। আমি সূর্যকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলাম। এজন্য সূর্য ব্রহ্মাকে নিয়ে আপনার এখানে এসেছে। হে জগৎ প্রভো! আমার ভক্তের কি গতি হবে। সূর্যের অভিশাপে আমার ভক্ত মৃত ও শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে। শ্রীভগবান বললেন— হে শঙ্কর! এই বৈকুণ্ঠে অর্ধঘটিকা সময়ে দৈব পরিমাণে সেখানে এক বিংশতি যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। তোমরা ভক্ত সুদারুণ কাল প্রভাবে মৃত হয়েছে। তার পুত্র হংসধ্বজও নিহত হয়েছে। এখন তার দুই পুত্র ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ পরম বৈষ্ণব। ধর্মধ্বজের স্ত্রীর গর্ভে লক্ষ্মী কলা দ্বারা জন্ম গ্রহণ করবেন।

নারায়ণ বললেন—হে নারদ! ধর্মধ্বজ পত্নী মাধবী দেব পরিমাণে শত বৎসর কাল গর্ভধারণ করেন। ধর্মধ্বজ পত্নী মাধবী শুভক্ষণে, শুভদিনে, শুভলগ্নে কার্ত্তিক মাসে পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবারে লক্ষ্মীর অংশরূপা এক সুমনোহর পদ্মিনী কন্যাকে প্রসব করেন। এই কন্যা রাজলক্ষ্মী চিহ্নযুক্তা, এর মুখমণ্ডল শরৎ কালীন পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায়, নয়ন যুগল প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায়, এর চরণে পদ্মচিহ্ন শোভিত, অধরোষ্ঠ বিম্বফল তুল্য রক্তিম ছিল।

হস্ততল ও পদতল রক্তবর্ণ ছিল। এর চম্পকবর্ণের কান্তি থেকে মণ্ডলাকারে রশ্মিচ্ছটা বিচ্ছুরিত হতো। সমস্ত রমণীগণের মধ্যে এই কন্যা একমাত্র সুন্দরী ছিল। তৎকালীন নরনারীগণ একে দর্শন করে তুলনা দান করতে অক্ষম হয়েছিল বলে পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ এই কন্যাকে তুলসী নামে অভিহিত করেছিলেন।

তুলসী ভূমিষ্ঠা হয়ে যোগ্যা স্ত্রীর ন্যায় তপস্যার জন্য বদরী বনে গমন করলেন। তথায় তিনি—"মম নারায়ণ স্বামী ভবেতেতি" 'নারায়ণ আমার স্বামী হোন।' এরূপ নিশ্চয় করে দৈব পরিমাণে লক্ষ বছর কঠোর তপস্যা করেন। তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা, শীতকালে আকণ্ঠ জলমগ্না হয়ে এবং বর্ষাকালে বর্ষাধারা সহ্য করে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। চল্লিশ হাজার বছর পর্যন্ত বায়ু ভক্ষণ করে এবং দশ হাজার বছর অনাহারে থেকে কঠোর তপস্যা করেন। একপদে দণ্ডায়মান হয়ে কঠোর তপস্যা করতে দেখে ব্রহ্মা হংস বাহনে বদরী বনে তুলসীকে বর দান করার জন্য আসেন। তুলসী তাঁকে দেখে প্রণাম করলেন। ব্রহ্মা বললেন— তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তুলসী বললেন—আমার যে বাসনা আছে তা বলছি। আমি পূর্বে গোলোক ধামে এক গোপী ছিলাম। আমি শ্রীকৃষ্ণের অংশ স্বরূপা এবং তাঁর প্রিয়া ও সখী। এক সময়ে আমি শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে অবস্থান করছিলাম, সেই সময় রাসেশ্বরী রাধারাণীর তথায় আগমন ঘটে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভৎসনা করেন এবং আমাকে অভিশাপ দেন এই বলে যে, তুমি মানবীরূপে মর্ত্য জগতে জন্মলাভ কর, তখন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সান্ত্বনা বাক্য বললেন—তুমি ভারত বর্ষে জন্ম লাভ পূর্বক কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে আমার অংশ স্বরূপ চতুর্ভূজ নারায়ণকে পতি রূপে প্রাপ্ত হবে। তাই আমি গোলোক হতে ভারত বর্ষে এসে জন্ম লাভ করেছি। হে ব্রাহ্মণ! আমি নারায়ণকে সম্প্রতি পতি রূপে লাভ করতে ইচ্ছা করি। —এই বর আমাকে প্রদান করুন।

ব্রহ্মা বললেন— তুলসী! শ্রীকৃষ্ণ হতে উৎপন্ন সুদামা নামে এক গোপ গোলোক ধামে ছিল। সে কৃষ্ণের অংশ স্বরূপ ও তেজস্বী। সেই সুদামা শ্রীরাধার অভিশাপে ভারতবর্ষে দানব বংশে "শঙ্খচূড়" নামে জন্ম গ্রহণ করেছে। বর্তমানে তার তুল্য

কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ নেই। পূর্বে গোলোক ধামে তাঁর মন তোমাতে আসক্ত ছিল। সে জাতিস্মর, সে তপস্যা করে আমার বরে তোমাকে লাভ করবে। এখন তুমি শঙ্খচূড়ের পতি হও, পরে নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করবে। তুমি নারায়ণের অভিশাপ বশতঃ বৃক্ষরূপা তুলসী বৃক্ষ হবে। তারপর ভগবান বিষ্ণুর প্রিয়তমা প্রিয়া হবে। তুমি বৃন্দাবনে "বৃন্দাবনী" নামে বৃক্ষরূপে অবস্থান করবে। গোপ গোপীগণ তোমারপত্র দ্বারা নিত্য মাধব কৃষ্ণের পূজা করবে। তুমি আমার বরে বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে নিরন্তর গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করবে।

তুলসী বললেন— হে ব্রাহ্মণ! দ্বিভুজ শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণে আমার যে রূপ অভিলাষ, সে রূপ চতুর্ভূজ নারায়ণে নেই। এ কথা আপনাকে সত্য করে বলছি। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে আমি চতুর্ভূজ নারায়ণকে পতিরূপে প্রার্থনা করছি। আমি আপনার কৃপা প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় অবশ্যই লাভ করব, কিন্তু আপনি আমাকে শ্রীরাধার ভয় হতে মুক্ত করে দিন। ব্রহ্মা বললেন—তুলসী! তোমাকে আমি শ্রীরাধিকার ষোড়শাক্ষর মন্ত্র প্রদান করছি। এই মন্ত্র প্রভাবে তুমি শ্রীরাধিকার প্রাণ তুল্যা সখী হবে এবং গোবিন্দের রাধাতুল্যা কল্যাণময়ী প্রিয়া হবে। এই কথা বলে তুলসীকে শ্রীরাধার মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ, পূজা বিধান প্রদান করে অন্তর্ধান হলেন। ব্রহ্মার উপদেশানুযায়ী দিব্য দ্বাদশ বছর ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। এভাবে তিনি তপস্যা ও মন্ত্র প্রভাবে সিদ্ধি লাভ করেন। তুলসী সিদ্ধিলাভ করার পরে সমস্ত দুঃখ ও উত্তম ভোজনাদি করে মনোরম শয্যায় শয়ন করলেন।

তুলসী পতি বাসনা করে অবস্থান করতে লাগলেন। এদিকে মহাযোগী পুরুষ শঙ্খচূড় মুনিবর জৈগিষব্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হন এবং পুষ্করে সিদ্ধিলাভ করেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ কবচ গলে ধারণ করে ব্রহ্মার নিকট হতে মনোবাঞ্ছিত বর লাভ করে বদরিকাশ্রমে গমন করেন। কামদেব তুল্য মনোমুগ্ধ কর কান্তিমান নবযৌবন সম্পন্ন শঙ্খচূড়কে তুলসী তথায় দর্শন করলেন এবং বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করত ঈষৎ হাস্য করলেন। শঙ্খচূড় অপূর্ব সুন্দরী সতী সাধ্বী তুলসীকে দেখে তার সমীপে উপবেশন করলেন। তারপর মধুর ভাষায় বলতে লাগলেন— হে মাননীয়ে ধন্যে!

তুমি কেন এই বনে বাস করছ? তুমি কার কন্যা? কল্যাণী তুমি কে? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি সর্ব কল্যাণ দায়িনী। শঙ্খচূড়ের বাক্য শুনে তুলসী বললেন— আমি ধর্মধ্বজের কন্যা তুলসী। তপস্যা করার জন্য এই তপোবনে বাস করছি। আপনি কে? যথাসুখে অন্যত্র গমন করুন। সৎকুলে জাত ব্যক্তি অত্যন্ত নির্জন স্থানে কোনও সৎকুল জাতা সতীকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। যে ব্যক্তি লম্পট অসৎ কুলে জাত, ধর্মশাস্ত্রজ্ঞান হীন সেই কামী ব্যক্তিই কামিনীকে অভিলাষ করেন। এই কামিনী আপাতঃ দৃষ্টিতে মধুর বটে কিন্তু শেষে পুরুষের পক্ষে অন্তক স্বরূপ হয়ে থাকে। কামিনী মধুর ভাষায় কথা বললেও তার অন্তর কিন্তু ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ। সে সতত স্বকার্য সাধনে তৎপর থাকে। কামিনী হরিভক্তির বিঘ্ন কারিণী, সংসারে বেধে রাখার রজ্জুস্বরূপা। স্বয়ং বিধাতা এই কামিনীকে মায়াবীদিগের মায়া রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মুমুক্ষ পুরুষগণের অদৃশ্যা বিষরূপে সৃষ্টি করেছেন। তুলসী এই কথা বলে বিরত হলেন।

শঙ্খচূড় বললেন হে দেবী! তুমি যে সব কথা বললেন তার কিছু অংশ সত্য এবং কিছু অংশ সত্য নয়। স্বয়ং বিধাতা সকলেরই মোহন স্বরূপ স্ত্রীরূপ দুই ভাগে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। (১) কৃত্যা রূপ, (২) বাস্তব রূপ। বাস্তব স্ত্রীরূপ প্রশংসনীয় কিন্তু কৃত্যা স্ত্রীরূপ নিন্দনীয়।

শ্রীরাধিকা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী এরা সৃষ্টির আদি সূত্র স্বরূপা, স্রষ্টা ব্রহ্মা এদের সৃষ্টি করেননি। এদের অংশরূপা যে স্ত্রীগণ তা বাস্তব বলে কথিত হয়। এরা যশোরূপ এবং সমস্ত মঙ্গলের কারণ। শতরূপা, দেবহূতি, স্বধা, স্বাহা, দক্ষিণা, রোহিনী, শচী, অদিতি, লোপমুদ্রা, অনসূয়া অরুন্ধতী, তারা, দময়ন্তী, বেদবতী, গঙ্গা, ধর্ম পত্নী মূর্তি, স্বস্তি প্রভৃতি স্ত্রীগণ যুগে যুগে আবির্ভূতা হন। এরা বাস্তব স্ত্রীরূপে বিখ্যাত।

মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, বিপ্রচিত্তি, উর্ব্বশী ইত্যাদি কুলটা স্ত্রীগণ কৃত্যা বলে নিন্দনীয়। কৃত্যা স্ত্রী দুই প্রকার রজোরূপা ও তমোরূপা। স্থানাভাব, সময়াভাব, প্রার্থীর অভাব, দেহক্লেশ, রোগ, সৎসঙ্গ, বহুজনগোষ্ঠীর মধ্যে বাস, শত্রুভয়, রাজভয়

ইত্যাদি কারণে রজোরূপা স্ত্রী সতীত্ব উৎপন্না হয় অর্থাৎ কোনও ভাবে এদের সতীত্ব রক্ষা পায়। পণ্ডিতগণ রজোরূপা স্ত্রীগণকে মধ্যম বলে অভিহিত করেছেন।

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তমোরূপা কৃত্যা স্ত্রীকে অধর্ম বলে জানেন। পরস্ত্রী নির্জনে, বা অতিশয় গোপনীয় স্থানে থাকলেও সৎকুল জাত ব্যক্তি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। শঙ্খচূড় বললেন—" হে শোভনে! ব্রহ্মার আদেশে আমি তোমার নিকট এসেছি। তোমাকে আমি গান্ধর্ব বিবাহ দ্বারা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করব। গোলোক ধামে আমি সুদামা নামে এক গোপ ছিলাম। এখন দানব বংশে শঙ্খচূড় নামে জন্ম গ্রহণ করেছি। রাধারাণীর অভিশাপে আমি এখন দানব শ্রেষ্ঠ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছি। শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র প্রভাবে আমি সব কিছুই জানি। তুমি গোলোক বাসিনী তুলসী এবং জাতিস্মরা। তুমি রাধার অভিশাপে ভারত বর্ষে জন্মগ্রহণ করেছে। একথা বলে শঙ্খচূড় বিরত হলেন। তখন তুলসী সহাস্য বদনে নিজের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। এই রূপবিদ্বান্ ব্যক্তি বিশ্ব মধ্যে প্রশংসার পাত্র। কামিনী নিজের কামনা অনুসারে এরূপ প্রিয় ব্যক্তিকে কান্ত করতে ইচ্ছা করেন। আজ আমি তোমরা নিকটে বিচারে পরাজিত হলাম। যে পুরুষ স্ত্রী কর্তৃক পরাজিত হয় সে পুরুষ জগতে নিন্দিত ও অপবিত্র থাকে। দেবগণ ও পিতৃগণ তার পূজা গ্রহণ করেন না। স্ত্রীজিৎ পুরুষের চিরকালই অশৌচ থাকে, শ্মশানে যখন তার দেহ দগ্ধ হয়, তখন সে শুদ্ধিলাভ করে। আমি তোমার বিদ্যা ও প্রভাব জানার জন্য তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। কারণ কামিনী প্রিয় পুরুষকে পরীক্ষাকরেই বররূপে গ্রহণ করেন। তপোবন মধ্যে তুলসী শঙ্খচূড়কে একথা বলে বিরত হলে তখন ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হলেন। তখন শঙ্খচূড় ব্রহ্মাকে নত মস্তকে প্রণাম করলেন। ব্রহ্মা শঙ্খচূড়কে গান্ধর্ব বিধানে তুলসীকে বিবাহ করতে আদেশ করলেন। ব্রহ্মা বললেন— হে তুলসী! মহাবলবান, সর্বগুণবান শঙ্খচূড়কে পতিরূপে গ্রহণ কর। যেমন— শিবে দুর্গা, অত্রিতে অনসূয়া, নলে দময়ন্তী, চন্দ্রে রোহিনী, কামদেবে রতি, বশিষ্টে অরুন্ধতী, গৌতমে অহল্যা, মনুতে শতরূপা, বৃহস্পতিতে তারা, যজ্ঞে দক্ষিণা, হুতাশয়ে স্বাহা, ইন্দ্রে শচী, ধর্মে মূর্তিদেবী আসক্তা হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, সেরূপ তুমি শঙ্খচূড়ে আসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ

কর। এই শঙ্খচূড় যখন মৃত হবে তখন তুমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে প্রাপ্ত হবে এবং গোলোকে গোবিন্দকেও প্রাপ্ত হবে। ব্রহ্মা এ কথা বলে তাদেরকে আশির্বাদ দিয়ে অন্তর্ধান হলেন। শঙ্খচূড় তখন তুলসীকে গন্ধর্ব বিধানে বিবাহ করলেন।

বিবাহের পর তাদের এক মন্বন্তর কাল অতিবাহিত হলো। সেই সময় মধ্যে শঙ্খচূড় দেব-গন্ধর্বাদি সকলকে শাস্তি দান করতেন। দেবগণ নিজেদের অধিকার হারিয়ে ভিক্ষুকের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। শঙ্খচূড় সেই সময় বলপূর্বক দেবগণের পূজা হোমাদি বিষয়, রাজ্য আশ্রয়াদি কেড়ে নিলেন। দেবগণ তখন ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং শঙ্খচূড়ের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে রোদন করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তখন দেবগণকে নিয়ে শিবের কাছে গিয়ে শঙ্খচূড়ের বৃত্তান্ত বললেন। তারপর শিব, ব্রহ্মা ও দেবগণ বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর কাছে গেলেন। তথায় তারা দ্বারপালগণের অনুমতি ক্রমে ষোড়শ দ্বার অতিক্রম করে শ্রীহরির পুষ্পরচিত মাল্যে সুশোভিত, চন্দনাদি গন্ধে সুগন্ধিত, মধুর সঙ্গীতে আমোদিত অতীব মনোহরণ শ্রীহরির আশ্রমে দেবগণের সহিত শঙ্কর ও ব্রহ্মা প্রবেশ করে শ্রীহরিকে দর্শন করলেন। শ্রীহরি সভা মধ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। গঙ্গাদেবী শ্বেত চামর দ্বারা ভক্তি সহকারে শ্রীহরির সেবায় রত ছিলেন। শ্রীহরিকে দর্শন করে দেবতা সকল প্রণাম করে স্তব করলেন।

তাঁদের মধ্য হতে ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলী হয়ে বিনয় সহকারে শ্রীহরির সম্মুখে জগতের বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। সর্বজ্ঞ শ্রীহরি ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করে মনোহর কথা বলতে লাগলেন। শ্রীভগবান বললেন— হে ব্রাহ্মণ! সেই শঙ্খচূড়ের সকল বৃত্তান্ত আমি জানি। সে পূর্বে সুদামা নামে মহাতেজস্বী গোপ ছিল। শ্রীরাধিকার অভিশাপে সে ভারত বর্ষে দানব জন্ম লাভ করেছে। গোলোকে স্বয়ং দ্বিভুজ কৃষ্ণরূপে একদিন আমি নিজ ভবন হতে মানিনী শ্রীরাধাকে ত্যাগ করে রাস মণ্ডলে গমন করি। শ্রীরাধা কিঙ্করী মুখে আমাকে বিরজার কুঞ্জে জেনে ক্রোধের সহিত আগমন করে আমাকে দেখতে পান। তারপর বিরজাকে নদীরূপ ধারণ করতে দেখে ও আমাকে অন্তর্হিত জেনে শ্রীরাধা ক্রোধান্বিতা হয়ে স্বভবনে গমন করে।

এক সময় সুদামা সহ আমাকে মান্দিরে দেখে আমাকে ভর্ৎসনা করে। আমার প্রতি ভর্ৎসনা শ্রবণ করে সুদামা রাধার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে। সুদামার ক্রোধ বাক্য শ্রবণ করে শ্রীরাধা অতীব রুষ্ঠা হন। সুদামাকে আমার সভা হতে বহিষ্কার করার জন্য সখীদের আজ্ঞা দেন এবং সুদামাকে দারুণ অভিশাপ প্রদান করেন। রে মূর্খ! তোর দানবের মত আচরণ, তুই দানব জন্মে গমন কর। —এ ভাবে সুদামা শাপ গ্রস্ত হন। শ্রীরাধিকার সখীগণ তখন সুদামাকে বহিষ্কার করল। সুদামা চলে যেতে লাগলে শ্রীরাধা করুণা বশতঃ তাকে যেতে বারণ করলেন। শ্রীরাধা সুদামাকে বললেন তুমি ক্ষণার্ধ কাল মধ্যে আমার প্রদত্ত শাপবাণী পালন করে মর্ত্যলোক হতে পুনরায় গোলোকে ফিরে আসবে।

শ্রীভগবান বললেন—“হে জগৎ বিধাতঃ! একথা অতি সত্য যে, গোলোকের এই ক্ষনার্ধ কাল (দুই মিনিট) পৃথিবীতে এক মন্বন্তর কাল (একাত্তর চতুর্যুগ) অতিবাহিত হবে। এই সময় অতিক্রান্ত হলে (শঙ্খচূড় রূপী) সুদামা গোলোকে গমন করবে।

হে দেবগণ! আমার এই ত্রিশূল নিয়ে ভারতে গমন কর। শিব এই ত্রিশূলের দ্বারা শঙ্খচূড়কে বধ করবে। সেই দানব শঙ্খচূড় আমার মঙ্গলময় কবচ ধারণ করে সমস্ত জগৎকে জয় করতে সমর্থ হয়েছে। এই কবচ কণ্ঠে থাকলে কেহই তাকে বধ করতে পারবে না। আমি ব্রাহ্মণ বেশে সেই কবচ প্রার্থনা করে হরণ করব। আমি তুলসীর সান্নিধ্যে গমন করলে শঙ্খচূড়ের মৃত্যু হবে। সেই কারণে আমি যে ক্ষণে তুলসীর সান্নিধ্যে গমন করব, সেই ক্ষণে শঙ্খচূড়ের মৃত্যু হবে। তারপর তুলসী দেহ ত্যাগ করে আমার প্রিয়া হবে। এই কথা বলে ভগবান—বিষ্ণু, শিবকে ত্রিশূল প্রদান করলেন। ত্রিশূল নিয়ে শিব ব্রহ্মাদি দেবগণ সহ ভারতবর্ষে গমন করলেন।

দানব শঙ্খচূড়কে বধ করার জন্য ব্রহ্মা শিবকে নিয়োগ করে ব্রহ্মালোকে স্বভবনে গেলেন। এদিকে মহাদেব দেবগণের নিস্তারের জন্য চন্দ্রভাগা নদীর তীরে বটবৃক্ষ মূলে অবস্থান করতে লাগলেন। তারপর শিব গন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্তকে দূত করে শঙ্খচূড়ের নিকট পাঠালেন। পুষ্পদন্ত শিবের আজ্ঞা অনুযায়ী শঙ্খচূড়ের নগরে গমন

করলেন। এই নগর পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ দশ যোজন দীর্ঘ। সাতটি পরিখা দ্বারা যুক্ত ও উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্ঠিত, শত শত বীথিকা, কোটি কোটি আশ্রম এবং বিবিধ চিত্র দ্বারা চিত্রিত। পুষ্পদন্ত এরূপ নগর মধ্যে গিয়ে শঙ্খচূড়ের ভবন দর্শন করলেন। এই ভবন পূর্ণিমার চন্দ্র মণ্ডলের ন্যায় গোলাকার এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাতুল্য চারটি পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই ভবন শত্রুগণের দুর্গম ছিল কিন্তু মিত্রগণের সুগমন অর্থাৎ গমন যোগ্য ছিল। গগন স্পর্শী অতি উচ্চ মণিময় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। দ্বারপাল যুক্ত দ্বাদশটি দ্বারে এই ভবন সুশোভিত ছিল। রত্নময় সোপান, রত্নময় কপাট ও রত্নময় কলস, রত্নসমূহে অঙ্কিত চিত্রসমূহে শোভিত ছিল। সুন্দর ও সুবেশধারী শতকোটি রক্ষীদ্বারা এই ভবন সুরক্ষিত ছিল। পুষ্পদন্ত মূখ্যদ্বারপালকে আগমন বৃত্তান্ত বললেন এবং তার আজ্ঞানুসারে ভিতরে প্রবেশ করলেন। এভাবে নয়টি দ্বার অতিক্রম করে অন্তঃপুরে গমন করে দ্বারপালকে বললেন—" হে দ্বারপাল! ভিতরে গিয়ে রাজা শঙ্খচূড়কে যুদ্ধের কথা নিবেদন কর। দ্বারপাল ভিতরে গিয়ে রাজা শঙ্খচূড়কে যুদ্ধের কথা নিবেদন করলেন। শঙ্খচূড় দূত পুষ্কদন্তকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন। তারপর পুষ্পদন্ত ভিতরে প্রবেশ করে শঙ্খচূড়কে দর্শন করলেন। রাজা শঙ্খচূড় সভামধ্যে রত্নখচিত স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল এক সেবক শঙ্খচূড়ের মস্তকে স্বর্ণছত্র ধারণ করে ছিল। কেহ চামরাদি দ্বারা ব্যজন, কেহ কেহ অন্যান্য সেবায় নিযুক্ত ছিল। অনেক দানব অস্ত্র ধারণ করে চারিদিকে পাহারায় রত ছিল। শঙ্খচূড়কে এরূপ দর্শন করে দূত পুষ্পদন্ত বিস্মিত হলেন। পুষ্পদন্ত শঙ্খচূড়ের নিকট উপস্থিত হয়ে শিব যে ভাবে যুদ্ধের বৃত্তান্ত বলেছিলেন সেইভাবে ঘটনা নিবেদন করলেন। পুষ্পদন্ত বললেন— " হে রাজন্দ্র! আমি শিবের দূত। আমার নাম পুষ্পদন্ত। শিব যা বলেছেন—তা আপনি শ্রবণ করুন। শিব বলেছেন—আপনি দেবগণের রাজ্য ও অধিকার প্রদান করুন। দেবগণ শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়েছেন। আপনাকেবধ করার জন্য শ্রীহরি শিবকে এক ত্রিশূল দিয়েছেন। শিব চন্দ্রভাগা নদীর তীরে বটমূলে অবস্থান করছেন। আপনি দেবগণের রাজ্য প্রদান করুন অথবা যুদ্ধ করুন। পুষ্পদন্তের কথা শুনে শঙ্খচূড় বললেন— হে

দূত! তুমি যাও। আমি প্রভাতে তার নিকট গমন করব। পুষ্পদন্ত গিয়ে শিবের কাছে শঙ্খচূড়ের বাক্য ও তার অপূর্ব ভবনের কথা বললেন।

এই সময়ে শিব সমীপে বিভিন্ন দেবগণ তথা শিব পরিকরগণ বিভিন্ন অস্ত্রাদি নিয়ে উপস্থিত হতে লাগল। নন্দী, স্কন্দ, বীরভদ্র, সুভদ্রক, মনিভদ্র, বলীভদ্র, বিশালাক্ষ, বিরূপাক্ষ, পিঙ্গলাক্ষ, কপিলাক্ষ, বান, বিরূপ, বিকম্পন, বিকট, বিকৃতি, তাম্রলোচন, কুটীচর, দুর্জয়, দুর্গম, অষ্টভৈরব, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, ইন্দ্রাদি দেবগণ দ্বাদশ আদিত্য, অগ্নি, চন্দ্র, বিশ্বকর্মা, কুবের, যম জয়ন্ত, বায়ু, বরুণ, বুধ, মঙ্গল, ধর্ম, শনি, ঈশান, কামদেবাদি আগমন করলেন। এছাড়াও দশভূজা, ভয়ঙ্করী, ভদ্রকালী, উগ্রদংষ্ট্রা, উগ্রচণ্ডা, কৈটভী, কোট্টরী এলেন। দেবী ভদ্রকালী রক্তবসত্র পরিহিতা, রক্তমাল্য ও গন্ধাদি অনুলেপন ধারণ করেছিলেন। অভয়া ভদ্রকালী ভক্তগণকে অভয়দান ও শত্রুদের ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর হাতে গগন স্পর্শী ত্রিশূল, শক্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বান, ধনু, মুষল, বজ্র, গড়গ, ফলক, বৈষ্ণবাস্ত্র, বারুনাস্ত্রি, আগ্নেয়াস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, গান্ধবাস্ত্র, গারুরাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, পার্ব্বতাস্ত্র, বায়বাস্ত্র, নাগপাশ, দন্ড, ও অন্যান্য শত শত দিব্যাস্ত্র ধারণ করেছিলেন। তিনি যোজন বিস্তৃতা বিকটাকার সুলোলা জিহ্বা প্রকাশ করেছিলেন। এ সময়ে বিকটাকার তিনকোটীডাকিনীর সহিত তিনকোটি যোগিনী উপস্থিত হলো। এছাড়াও ভূত, প্রেত, পিশাচ, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, যক্ষ, কিন্নরাদি উপস্থিত হলো। —এই সময় শক্তিগণের সহিত কার্ত্তিকেয় শিবকে প্রণাম করে শিবের আজ্ঞানুসারে সকলে উপবেশন করলেন। দূত পুষ্পদন্ত চলে যাওয়ার পর শঙ্খচূড় অন্তপুরে প্রবেশ করে তুলসীকে রণবার্তা বললেন। তুলসী রণবার্তা শুনে ভয়ে তার কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হলো। তুলসী ব্যথিত হৃদয়ে বললেন— হে প্রাণনাথ! ক্ষণকাল আমার জীবন রক্ষা কর। যা বাসনারূপে আছে তা কৃতকার্য্য কর। আমি তোমার ক্ষণকাল নয়নদ্বারা দর্শন করি। আমার প্রাণ-মন আন্দোলিত হচ্ছে ও অত্যন্ত দগ্ধীভূত হচ্ছে। আমি রাত্রি শেষে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছি। তুলসীর বাক্য শ্রবণ করে রাজা শঙ্খচূড় পান ভোজনাদি সমাপন করলেন। তারপর তুলসীকে হিতোপদেশ প্রদান করলেন। শঙ্খচূড় বললেন—নিজ জিন কর্মফল ভোগরে জন্য কালই সকলকে

শুভ, অশুভ, হর্ষ, বিষাদ, সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক, মঙ্গল অমঙ্গল—এই সমস্ত কর্ম ফলের সহিত সংযোজিত করেন। বৃক্ষকালে উৎপন্ন হয়ে ক্রমে শাখা, পত্র, পুষ্প এবং শেষে ফলবান হয়। যথা সময়ে কাল উপস্থিত হলে বৃক্ষ কাল কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। ভূতগণ কালে উৎপন্ন হয় এবং কালমধ্যে বিলীন হয়। বিশ্বকালে সৃষ্টি হয় এবং কালে বিলীন হয়ে যায়। যিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি দেবগণে ঈশ্বর সেই পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা ভজনা কর। ব্রহ্মা হতে আরম্ভ করে তৃণ পর্যন্ত দৃশ্যমান সবকিছুই কৃত্রিম। কারণ এই সবই কালক্রমে নষ্ট হয়। তুমি ত্রিজগতের অতীত, সত্য স্বরূপ, সর্বেশ্বর, সর্বরূপ, সর্বত্মা, রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা কর। মৃত্যুর মৃত্যু, কালের কাল, যমের যম, স্রষ্টার স্রষ্টা, পালকের পালক, সংহতারও সংহর্তা পরমব্রহ্ম লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হও। প্রিয়ে! এই জগতে কে কার বন্ধু হতে পারে? যিনি সকলের বন্ধু সেই পরম বন্ধু সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজনা কর। আমিই বা কে? আর তুমিই বা কে? কেবল আমাদের কর্মবশতঃ তোমার সহিত আমাকে বিধি মিলিত করেছেন, আবার সময় হলে তিনি আমাদের বিচ্ছেদও করবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অজ্ঞান, সে ব্যক্তিই বিপদকালে শোকে কাতর হন। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি জানেন যে, এ জগতে সুখ, দুঃখ, মিলন, বিচ্ছেদ চক্রের নেমির ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করছে।

হে প্রিয়তমে, তুলসী! তুমি যাঁর জন্য পূর্বে বদরিকাশ্রমে তপস্যা করেছিলে সেই নারায়ণকেই তুমি পতিরূপে নিশ্চিতই প্রাপ্তা হবে। আমি তোমাকে তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মার বরে লাভ করেছি। তুমি শ্রীহরিকে লাভ করার জন্য তপস্যা করেছ। সুতরাং তুমি শ্রীহরিকেই লাভ করবে। পরে তুমি গোলোক বৃন্দাবনে গোবিন্দকে লাভ করবে। পূর্বে আমি সুদামা নামে গোলোকে ছিলাম। আমি দানব কুলজাত দেহত্যাগ করে গোলোকে গমন করব। তথায় তুমি আমাকে দেখতে পারে এবং আমিও তোমাকে দেখতে পাব। শ্রীরাধিকার অভিশাপ বশতঃ আমি দুর্লভ ভারতবর্ষে জন্ম লাভ করেছি। আমরা উভয়ই গোলোক ধামে গমন করব। তুমি আমার জন্য আর কাতর হবে না। এই বলে শঙ্খচূড় বিরত হলেন।

তারপর শঙ্খচূড় ও তুলসী উভয়ই রত্নমন্দিরে রাত্রি অতিবাহিত করলেন। রাত্রি শেষে কৃষ্ণপরায়ণ রাজা শঙ্খচূড় শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান করে মনোহর শয্যা ত্যাগ করলেন। তারপর স্নান পূর্বক বস্ত্রাদি পরিধান করে তিলক—আহ্নিকাদি করলেন এবং অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা-প্রার্থনাদি সমাপ্ত করলেন। অনন্তর মঙ্গলময় দধি, ঘৃত, মধু, খই, দর্শন করেন। উত্তম ব্রাহ্মণকে রত্ন, বস্ত্র, সুবর্ণ, ধেনু, স্বর্ণ, সহস্র ভাণ্ডার ধন দান পূর্বক পুত্র সুচন্দ্রকে রাজেন্দ্র পদে অভিষিক্ত করে রাজ্য, প্রজাগণ, সম্পদাদি সমর্পণ করেন। রাজা শঙ্খচূড় তারপর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে কবচ ধারণ পূর্বক হস্তে ধনু গ্রহণ করলেন। তিনলক্ষ অশ্ব, পাঁচলক্ষ হস্তী, দশ হাজার রথ, তিনকোটী ধনুর্ধারী সৈন্য, তিনকোটী চর্মধারী, তিনকোটী শূলধারী—এই ভাবে অপরিমিত সৈন্য সংগ্রহ করলেন। বিশাল বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধশাস্ত্র বিশারদ মহাবল যোদ্ধাকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন। তারপর শঙ্খচূড় শ্রীহরিকে স্মরণ করে শিবির হতে বের হলেন। বিমানে আরোহন করে গুরুজনদের সামনে রেখে শিবের সন্নিধানে গমন করলেন।

পুষ্পভদ্রা নদীতটে এক অক্ষর বট আছে। সেই স্থানে "সিদ্ধক্ষেত্র" সিদ্ধগণের এক সিদ্ধাশ্রম আছে। সেই পুণ্য ক্ষেত্র কপিলের তপস্থান। এর পশ্চিমে সাগর, পূর্বে মলয় পর্বত, দক্ষিণে শ্রীশৈল পর্বত, উত্তরে গন্ধমাদন পর্বত। এই স্থান প্রস্তে পাঁচ যোজন, দৈর্ঘ্যে শত যোজন। শঙ্খচূড় তথায় গমন করে অক্ষর বটমূলে কোটি সূর্য সদৃশ দেদীপ্যমান চন্দ্র শেখর শিবকে দর্শন করলেন। তিনি ত্রিলোচন ও পঞ্চবদন, নাগকে যজ্ঞসূত্র রূপে ধারণ করেছেন, হাতে পট্টিশ ও ত্রিশূল। শিবকে দর্শন করে শঙ্খচূড় বিমান হতে নেমে সপরিকরে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। এইরূপে শিবের বামে ভদ্রকালীকে এবং অগ্রে স্কন্দকেও প্রণাম করলেন। শিব, ভদ্রকালী, এবং স্কন্দ শঙ্খচূড়কে আশির্বাদ করলেন। রাজা শঙ্খচূড় সকলকে সম্ভাষণ করে শিবের সন্নিধানে উপবেশন করলেন।

শিব প্রসন্নচিত্তে শঙ্খচূড়কে বলতে লাগলেন—ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তার পুত্র কশ্যপ। দক্ষ কশ্যপকে তের জন কন্যা দান করেন। সেই তের জন কন্যার মধ্যে দনুর চল্লিশ

জন পুত্র হয়। দনু থেকে জাত বলে এরা দানব নামে পরিচিত। সেই চল্লিশ জন পুত্র মধ্যে এক জনের নাম বিপ্র চিত্তি। দম্ভ নামে তার এক পুত্র ছিল। সেই দম্ভ লক্ষ বছর পুষ্করে তপস্যা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করেন। সেই সময় দম্ভ কৃষ্ণপরায়ণ তোমাকে (শঙ্খচূড়) পুত্ররূপে লাভ করে। পূর্বে তুমি গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রধান অষ্টগোপের মধ্যে সুদামা নামে গোপ ছিলে। তুমি রাধিকার অভিশাপে শঙ্খচূড় নামে ভারতবর্ষে দানবেশ্বর হয়েছে। তুমি বৈষ্ণব, বৈষ্ণব আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্ত নশ্বর বলে জানেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীহরির সেবা ব্যতীত আর কিছুই চাহে না। মুক্তি, ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, কুবেরত্ব, ইত্যাদি প্রার্থনীয় বলেই মনে করেন না। তুমি কৃষ্ণভক্ত, তোমার এই ভ্রমাত্মক রাজ্যে কি প্রয়োজন আছে? তুমি দেবগণকে রাজ্য প্রদান কর ও আমার প্রীতি সম্পাদন কর। তুমি সুখে নিজ রাজ্যে অবস্থান কর এবং দেবগণও নিজ রাজ্যে অবস্থান করুক। দেবগণ ও দানবগণ সকলেই কশ্যপ বংশজাত। সুতরাং ভ্রাতৃবিরোধে মহাপাপ। যদি তুমি মনে কর এতে তোমার সম্পদের হানি হবে, তাতে আমার বক্তব্য এই যে, সকল অবস্থায় সর্বদা সমানভাবে কারও যায় না। দেখ-চন্দ্র, সূর্য্য উদয় হয়, অস্তমিত হয়। রাহু গ্রস্ত হয়, মেঘাচ্ছন্ন দিনে ম্লান হয়। পৃথিবী কালে প্রলয় হয়ে জলে নিমগ্ন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার কালক্রমে সৃষ্টি হয়। চরাচর কালে নাশ প্রাপ্ত হয় এবং কালে উৎপন্ন হয়। যে একমাত্র সতত শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্তন করে সেই ব্যক্তি কালকেও মৃত্যুকেও জয় করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণই আমাকে (শিবকে) সংহার কর্তা করেছেন। অর্থাৎ আমরা সকলে স্বাধিকার ভোগী। আমার বিষয় হলো সংহার করা। সেই সংহার কার্যে কালাগ্নি রুদ্রকে নিয়োগ করে আমি সতত শ্রীকৃষ্ণ গুণ-গান কীর্তন করি এবং তাতে আমি মৃত্যুঞ্জয় হয়েছি। সর্প যেমন গড়ুরের নিকট হতে পালায়ণ করে সেরূপ মৃত্যুও আমার নিকট হতে পালায়ণ করে। —একথা বলে শিব সভা মধ্যে নীরব হলেন।

রাজা শঙ্খচূড় শিবের বাক্য শ্রবণ করে খুব প্রশংসা করলেন এবং বিনয় সহকারে মধুর ভাষায় শিবকে বলতে লাগলেন। শঙ্খচূড় বললেন—নাথ! আপনি যা বললেন তা সম্পূর্ণ সত্য। আপনি আমার কিছু নিবেদন শ্রবণ করুন। আপনি এখন এই যে

কথা বললেন—জ্ঞাতি দ্রোহ মহাপাপ হয়, তা হলে কি হেতু মহারাজ বলির সর্বস্ব হরণ করে তাকে পাতালে প্রেরণ করা হলো। দেবগণ ভ্রাতা বিরণ্যকশিপুর সাথে হিরণ্যাক্ষকে কেন বধ করল। সমুদ্র মন্থনের সময় দেবগণ অমৃত ভক্ষণ করেছে আর আমরা সকলে ক্লেশভাগী হয়েছিলাম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমুদ্র মন্থনের ফল তারাই ভোগ করেছে। এই বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া ভাণ্ড স্বরূপ। তিনি যে সময় যাহাকে ঐশ্বর্যদেন তিনিই তৎকালীন ঐশ্বর্য ভোগ করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে—এই দেব দানবের—এই ব্যাপার কোন "নিমিত্ত" করে হয়ে থাকে। এই বিবাদে কখনো দেবতাদের জয় আর দানবের পরাজয়, আবার কখনো দানবের জয় দেবতাদের পরাজয় হয়। এই বিবাদে আপনার আগমন নিস্ফল। কেননা আপনি দেব ও দানবের উভয় পক্ষের বন্ধু। উভয় পক্ষে আপনি সমান সম্বন্ধ যুক্ত। সেই আপনি যে এখন আমাদের সাথে স্পর্দ্ধা দেখিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছেন, তা আপনার পক্ষে লজ্জার বিষয় আবার যদি সত্যিই যুদ্ধ হয়, তা হলে আরও অধিক লজ্জার বিষয়। আবার যুদ্ধে যদি আপনরা পরাজয় হয় তা হলে আপনার কীর্ত্তি হানি হবে। শঙ্খচূড়ের কথা শুনে শিব বললেন—রাজন! ব্রহ্মবংশজাত তোমাদের সহিত আমার যুদ্ধে লজ্জার কি আছে? আর পরাজয়ে লজ্জা হানিরই বা কি আছে? পূর্বে মধু কটভের সাথে শ্রীহরির যুদ্ধ হয়েছিল, হিরণ্যাক্ষের সাথে নারায়ণের যুদ্ধ হয়েছিল। হিরণ্যকশিপুর সাথে বিষ্ণুর যুদ্ধ হয়েছিল। আমিও পূর্বে ত্রিপুরের সাথে যুদ্ধ করেছি। প্রকৃতিদেবী দুর্গার সাথে শুম্ভাদি দৈত্যগণের যুদ্ধ হয়েছিল। তুমি শ্রীকৃষ্ণের এক পার্ষদ। পূর্বে যে দৈত্যগণ নিহত হয়েছে তারা কেহই তোমার সমান ছিল না। রাজন! তোমার সহিত আমার এই যুদ্ধে লজ্জার কি আছে। শ্রীহরিই আমাকে এই যুদ্ধে প্রেরণ করেছেন। তুমি দেবগণের রাজ্য প্রদান কর অথবা আমার সাথে যুদ্ধ কর। এটাই আমার নিশ্চিত বাক্য। এই কথা বলে শিব বিরত হলেন। তখন শঙ্খচূড় স্বীয় মন্ত্রীরগণের সাথে সত্বর উত্থিত হলেন।

দানব রাজ শঙ্খচূড় শিবকে প্রণাম করে যানে আরোহন করলেন এবং স্বসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন শিবও দেবগণকে যুদ্ধের জন্য পাঠালেন। উভয় পক্ষে

তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। ইন্দ্র দানব বৃষপর্বার সাথে, সূর্য্য বিপ্রচিত্তির সাথে চন্দ্র দম্ভাসুরের সাথে, অগ্নি গোকর্ণের সাথে যম সংহারের সাথে, বিশ্বকর্মা ময়ের সাথে, বরুণ কলবিঙ্কের সাথে, বায়ু চঞ্চলের সাথে, শনি রক্তাক্ষের সাথে, বসুগণ বচ্চাগণের সাথে, নলকুবের ধূম্রসারের সাথে, একাদশ মহারুদ্র একাদশ ভয়ঙ্কর অসুরের সাথে দানবের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলো। বট মূলে তখন ভদ্রকালী, স্কন্দ ও শিব অবস্থান করতে লাগলেন। অন্যদিকে কোটি দানবগণের সহিত শঙ্খচূড় রত্নসিংহাসনে অবস্থান করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে শিবের যোদ্ধাগণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালায়ণ করতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে স্কন্দ স্বগনের তেজ বৃদ্ধি করে দানব দিগের সহিত যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং শত অক্ষৌহিণী দানব সৈন্য বধ করলেন। তখন কমললোচনা কালী দানবগণের শত খর্পর রক্তপান করলেন। তিনি তখন দশলক্ষ হাতী, শতলক্ষ অশ্ব, একহস্তে গ্রহণ করে স্বীয় মুখে নিক্ষেপ করলেন। সেই সময় যুদ্ধ ক্ষেত্রে সহস্র সহস্র মুণ্ডহীন দেহ উঠে নৃত্য করতে লাগল। স্কন্দের বান জালে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সমস্ত দানবগণ ভয়ে পলায়ণ করতে লাগলেন। দানবগণের ক্ষয়কর এবং প্রাকৃতিক প্রলয়ের ন্যায় স্কন্দের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দেখে রাজা শঙ্খচূড় বিমানে আরোহন করে স্কন্দের উপরে বাণ বর্ষণ আরম্ভ করলেন। পরে শঙ্খচূড়, সর্প, শিলা, পর্বত বৃক্ষ সমূহ বর্ষণ করে স্কন্দ কার্ত্তিককে আচ্ছন্ন করে ফেললেন। ফলে কার্ত্তিকের রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো এবং রথের অশ্বগণ নিহত হলো। অনন্তর শঙ্খচূর এক প্রাণ ঘাতিনী শক্তি স্কন্দের উপর নিক্ষেপ করলেন। শক্তির আঘাতে স্কন্দ মূর্চ্ছিত হলেও পুনরায় চেতনা লাভ করে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করলেন এবং শঙ্খচূড়ের উপর উল্কাতুল্য এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন। তাতে শঙ্খচূড় মূর্চ্ছিত হলেও উঠে শত সূর্য্য তুল্য এক শক্তির আঘাতে স্কন্দ মূর্চ্ছিত হলেন। তখন দেবী কালী তাকে ক্রোড়ে নিয়ে শিব সমীপে গেলেন। শিব তাকে জীবিত করে অনন্ত শক্তি প্রদান করলেন। তারপর দেবী কালী রণস্থলে গমন করে সিংহনাদ করলেন। তাতে দানব সৈন্যগণ মূর্চ্ছিত হলো।

শঙ্খচূড় যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেবী কালীকে দর্শন করে আগমন করলেন। দেবী কালী এক আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলে শঙ্খচূড় পার্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা তা নির্বাপিত করেন, দেবী কালী

বারুনাস্ত্র নিক্ষেপ করলে শঙ্খচূড় গান্ধর্ব অস্ত্রের দ্বারা তা ছেদন করেন। দেবী কালী মহেশ্বরাস্ত্র নিক্ষেপ করলে শঙ্খচূড় বৈষ্ণবাস্ত্র দ্বারা তা ছেদন করেন। তারপর কালী নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করলে রাজা শঙ্খচূড় নারায়ণাস্ত্র দেখে রথ হতে নেমে তাকে প্রণাম করলেন। নারায়ণাস্ত্র উর্দ্ধ দিকে গমন করল। তারপর দেবী কালী পাশুপতাস্ত্র গ্রহণ করলে তখন আকাশবাণী হলো যে, পাশুপতাস্ত্র দ্বারা শঙ্খচূড়ের মৃত্যু হবে না। যে পর্যন্ত শঙ্খচূড়ের কণ্ঠে শ্রীহরির কবচ আছে। সতী তুলসী অবিচলিত ভাবে স্থির থাকবে সে পর্যন্ত শঙ্খচূড়ের মৃত্যু হবে না। তখন দেবী লক্ষ লক্ষ দানবকে ধরে গ্রাস করলেন। দেবী তখন ক্রোধে শঙ্খচূড়ের রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করলেন। দেবী এক মুষ্টি দ্বারা শঙ্খচূড়কে আঘাত করলে কিছুকালের জন্য মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। পরে আবার শঙ্খচূড় চেতনা পেয়ে উঠে দাঁড়ান। শঙ্খচূড় দেবী কালীর সহিত বাহুযুদ্ধ করলেন না বরং দেবীকে মাতৃ বোধে প্রণাম করলেন। তারপর দেবী শঙ্খচূড়কে ধরে উদ্ধদিকে নিক্ষেপ করলে শঙ্খচূড় মাটিতে পড়ে দেবীকে আবার প্রণাম করলেন। দেবী কালী অনেক দানব ভক্ষণ করে শিব সমীপে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। দেবী কালী শিবকে বললেন—"শঙ্খচূড় আমার বধ্য নহে" —এরূপ দৈববাণী হলো। রাজা শঙ্খচূড় মহাজ্ঞানী ও মহাবলীয়ান সে আমার উপর কোন অস্ত্র নিক্ষেপ করে নাই। কেবল আমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রই ছেদন করছে।

শিব যুদ্ধের বিষয় অবগত হয়ে স্বগণের সহিত যুদ্ধে গমন করলেন। শঙ্খচূড় শিবকে দর্শন করে ভূতলে পতিত হয়ে প্রণাম করলেন। শিবও শঙ্খচূড়ের মধ্যে পূর্ণ এক বছর যুদ্ধ চলল। কারও জয় পরাজয় হলো না। তখন উভয়ে নিজ নিজ অস্ত্র রেখে দিলেন। সেই সময় দানব পক্ষের মাত্র একশত জন অবশিষ্ট ছিল। দেবগণের পক্ষে যারা নিহত হয়েছিল শিব তাদের জীবিত করলেন। তখন ভগবান বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপে শঙ্খচূড়ের নিকট গমন করলেন এবং বললেন—" হে রাজেন্দ্র! আমি নিরাহারী পীড়িত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর। আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর।

রাজা শঙ্খচূড় প্রসন্ন বদনে বললেন—আমি আপনার বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করব। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশী বিষ্ণু মায়া অবলম্বন করে বললেন—আমি আপনরা কণ্ঠস্থিত কবচ প্রার্থনা করি। ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনে শঙ্খচূড় তাকে কবচ প্রদান করলেন। ব্রাহ্মণ বেশী শ্রীহরি কবচ নিয়ে গমন করলেন। তারপর নারায়ণ শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করে তুলসীর সান্নিধ্যে গমন করলেন।

অনন্তর এদিকে যুদ্ধস্থলে শিব হরিপ্রদও ত্রিশূল দানব শঙ্খচূড়ের প্রতি নিক্ষেপের জন্য গ্রহণ করলেন। এই ত্রিশূলের অগ্রভাবে নারায়ণ অধিষ্ঠিত, মধ্যভাগে ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত, মূলদেশে শিব অধিষ্ঠিত এবং তীক্ষ্ণ ধার মধ্যে সর্বসংহাক কাল অধিষ্ঠিত আছেন। এই ত্রিশূল সহস্র ধনু দীর্ঘ (চার হাতে এক ধনু), প্রস্থে শত হস্ত প্রমান ছিল। এই ত্রিশূল সজীব, ব্রহ্ম স্বরূপ নিত্য ও অনির্মিত ছিল। এই ত্রিশূল সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ধ্বংস করতে সমর্থ। এই ত্রিশূলকে ঘুড়িয়ে শিব তুলসীরপতি রাজা শঙ্খচূড়ের উপর নিক্ষেপ করলেন। তখন রাজা শঙ্খচূড় স্বীয় ধনু পরিত্যাগ করে যোগাসন করতঃ ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল ধ্যান করতে লাগলেন।

"রাজা চাপং পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজম্।
ধ্যানং চকারং ভক্ত্যা চ কৃত্বা যোগাসনং ধিয়া।।
শূলঞ্চ ভ্রমণং কৃত্বা পপাত দানবোপরি।
চকার ভস্মসাত্তঞ্চ সরথঞ্চাবলীলয়া।।
রাজা ধৃত্বা দিব্যরূপং কিশোর গোপবেশকম্।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং রত্ন ভূষণ ভূষিতম্।।
রত্নেন্দ্রসারনির্মাণং বেষ্টিতং গোপ কোটিভিঃ।
গোলোকাদাগতং যানমারুহ্য তৎপুরং যযৌ।।
গত্বা ননাম শিরসা রাধা মাধবয়োর্মুনে।
ভক্ত্যা তচ্চরণাম্ভোজং রাসে বৃন্দাবনে বনে।
সুদামানং তৌ চ দৃষ্টা প্রসন্নবদনেক্ষণৌ।।"

—ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রকৃতি খণ্ড, ২০/১৯-২৩

অনুবাদঃ রাজা শঙ্খচূড় যখন শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তখন শিব নিক্ষিপ্ত সেই শূল ঘুরতে ঘুরতে দানব শঙ্খচুরের উপর পতিত হলো এবং তৎক্ষণাৎ রথ সহ শঙ্খচূড়কে অনায়াসে ভস্মীভূত করল। তারপর রাজা শঙ্খচূড় দ্বিভূজ, মুরলী হস্ত, রত্নভূষণে ভূষিত কিশোর ও দিব্য গোপবেশ ধারণ করে গোলোক হতে আগত রথে আরোহণ করে গোলোকে গমন করলেন। গোলোক বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে কুঞ্জমধ্যে অবনত মস্তকে রাধা-মাধবের চরণকমলে ভক্তিসহকারে প্রণাম করলেন। রাধা-মাধবও প্রফুল্লিত হয়ে দর্শন দান করে প্রসন্ন হলেন।

শিব নিক্ষিপ্ত শূল পুনরায় শিব হস্তে ফিরে গেলেন। শিব শূলপাণি আখ্যা প্রাপ্ত হলেন। শিব শূলের দ্বারা শঙ্খচূড়ের অস্থি সমূহ সাগরে নিক্ষেপ করলেন। অস্থিদ্বারা শঙ্খজাতির সৃষ্টি হলো। নানা প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট শঙ্খজাতি নিত্য সদাই পবিত্র। শঙ্খের জল দেবার্চ্চনে প্রশস্ত। যেখানে শঙ্খধ্বনি হয় সেখানে লক্ষ্মী অচলা হয়ে বিরাজ করেন। যে ব্যক্তি শঙ্খজলে স্নান করে সেই ব্যক্তি বিধি অনুসারে সমস্ত তীর্থেই স্নান করে থাকেন। কারণ শঙ্খে শ্রীহরি অধিষ্ঠিত আছেন। লক্ষ্মীদেবীও সতত সেখানে বিরাজ করেন। সেস্থান হতে সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হয়ে যায়।

নারদ বললেন—ভগবান! বিষ্ণু তুলসীর সান্নিধ্যে কিরূপে এলেন তা বর্ণনা করুন। নারায়ণ বললেন—ভগবান বিষ্ণু দেবগণের কার্যসাধনের জন্য শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করে তুলসীর কাছে এসেছিলেন। বিষ্ণু মায়াবলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে শঙ্খচূড়ের কবচ গ্রহণ করে তুলসীর গৃহে গমন করেন। তিনি তুলসীর গৃহ দ্বার সমীপে চর দ্বারা দুন্দুভিবাদ্য বাজালেন এবং "মহারাজের জয় হোক" ইত্যাদি জয় শব্দ দ্বারা তুলসীকে নিজের আগমন বার্তা জ্ঞাপন করলেন। সেই আগমন বার্তা শুনে তুলসী আনন্দিতা হয়ে জানালা দিয়ে রাজপথ দেখতে লাগলেন। তুলসী সেই সময় ব্রাহ্মণদের ধনদান করে মাঙ্গলিক কার্যের অনুষ্ঠান করলেন। এদিকে শঙ্খচূড় রূপধারী বিষ্ণু রথ হতে নেমে তুলসীর ভবনের দিকে গমন করলেন। তুলসী প্রিয় পতিকে দর্শন করে তার পাদধৌত করলেন, তারপর প্রণাম করলেন। তুলসী প্রিয় পতিকে রত্নসিংহাসনে বসিয়ে সুবাসিত তাম্বুল প্রদান করলেন। রণস্থল হতে আগত

পতিকে দর্শন করে তুলসী নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন এবং প্রিয়তম পতির নিকট যুদ্ধ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন। যিনি অসংখ্যক বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, ধ্বংসকর্তা, তাঁর সাথে আপনার কিভাবে বিজয় হলো, তা কৃপা করে বলুন। তুলসীর বাক্য শ্রবণ করে শঙ্খচূড় রূপধারী বিষ্ণু হাস্য পূর্বক এই মিথ্যা বাক্য বললেন। প্রিয়ে! আমাদের উভয়ের এক বছর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সমস্ত দানব গণের বিনাশ হয়। তারপর ব্রহ্মা এসে আমাদরে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। তখন আমি ব্রহ্মার বাক্যে দেবগণের অধিকার প্রদান করি। তারপর আমি আমার ভবনে চলে আসি এবং শিব শিবলোকে গমন করেন, এই কথা বলে শয়ন করলেন। তুলসী বিষ্ণুর সন্নিধানে আচরণের ব্যতিক্রম মনে করে মনে মনে তর্ক—বিতর্ক করতে লাগলেন এবং শঙ্খচূড়রূপী বিষ্ণুকে বললেন—তুমি কে? মায়েশ্বর! তুমি কে? বল। তুমি আমার ধর্ম হরণ করেছ। আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করব। তুলসীর বাক্য শ্রবণ করে বিষ্ণু নিজ মূর্তি ধারণ করলেন। তখন তুলসী দেখতে পেলেন—

"দদর্স পুরতো দেবী দেবদেবং সনাতনম্।
নবীন নীরদশ্যামং শরৎপঙ্কলোচনম্।।
কোটিকন্দর্পলীলাভং রত্নভূষণভূষিতম্।।
ঈষদ্ধাস্যং প্রসন্নাস্যং শোভিতং পীতবাসসা।।

অনুবাদ ঃ— সেই তুলসী তখন সম্মুখে শারদীয় কমল তুল্য নয়নশোভিত নবঘন শ্যাম সুন্দর দেবদেব সনাতন পরম পুরুষ নারায়ণকে দর্শন করলেন। তিনি কোটি কামদেবের ন্যায় স্বাভাবিক লাবণ্য বিশিষ্ট, রত্নভূষণ সমূহে বিভূষিত, ঈষৎ হাস্যময়, প্রসন্নবদন এবং পীতবস্ত্রে শোভিত ছিলেন।

ভগাবন নারায়ণকে দর্শন করে তুলসী দেবী কামাবেশে মূর্চ্ছিতা হলেন। পুনরায় অনায়াসে চেতনা লাভ করে সেই তুলসীদেবী শ্রীহরিকে পুনর্বার বললেন—

"তুলস্যুবাচ!—

হে নাথ! তে দয়া নাস্তি পাষাণ সদৃশস্য চ।

ছলেন ধর্ম ভঙ্গেন মম স্বামী ত্বয়া হতঃ।।
পাষাণ সদৃশস্ত্বঞ্চ দয়াহীনো যতঃ প্রভো।
তস্মাৎ পাষাণরূপস্ত্বং ভুবি দেব ভবাধুনা।।

ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রকৃতি খণ্ড-২/২৩-২৪

অনুবাদঃ— তুলসী বললেন হে নাথ! আপনার দয়া নাই, আপনি পাষাণ-সদৃশ। আপনি ছলে আমার ধর্মভঙ্গ করে আমার স্বামীকে অন্যের দ্বারা বধ করিয়েছেন। প্রভো! যেহেতু আপনি পাষাণ- সদৃশ দয়াহীন, সেই হেতু হে দেব! আপনি ভূতলে পাষাণ হোন। যারা আপনাকে দয়ার সাগর বলে তারা ভ্রান্ত। যিনি আপনার ভক্ত, তাকে আপনি বিনা অপরাধে অপরের জন্য কেন বধ করলেন? আপনি সর্বত্মা ও সর্বজ্ঞ হয়েও পরের ব্যথা বুঝেন না। আপনি এক জন্মে আত্ম বিস্মৃত হবেন (তুলসীর শাপে রাম অবতারে ভগবান আত্ম বিস্মৃত হয়)। এ কথা বলে তুলসী বিষ্ণুর চরণতলে পরে রোদন করতে লাগলেন। তুলসীকে বিলাপ করতে দেখে ভগবান বিষ্ণু বললেন,— সাধ্বি! তুমি ভারতবর্ষে আমাকে পতিরূপে লাভ করার জন্য দীর্ঘকাল তপস্যা করেছ এবং শঙ্খচূড়ও তোমাকে প্রাপ্ত হবার জন্য বহুকাল তপস্যা করেছে এবং পত্নীরূপে তোমাকে লাভ করে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছে। এখন তোমার তপস্যার ফল তোমাকে আমার দেওয়া উচিৎ। তুমি এই দেহ ত্যাগ করে দিব্য দেহ ধারণ করতঃ রাস মন্ডলে আমার সহিত বিহার করবে।

"শ্রীভগবানুবাচ—

ইয়ং তর্নুনদীরূপা গণ্ডকীতি চ বিশ্রুতা।
পূতা সুপুণ্যদা নৃনাং পুণ্যা ভবতু ভারতে।।
তব কেশ সমূহাশ্চ পুণ্যবৃক্ষা ভবন্তিতি।
তুলসী কেশ সম্ভূতা তুলসীতি চ বিশ্রুতা।।"

—ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রঃ খণ্ড

অনুবাদ ঃ— ভগবান বললেন- তোমার এই দেহ নদীরূপ ধারণ করতঃ এই

ভারতে গণ্ডকী এই নামে মনুষ্যগণের পবিত্র পুণ্য দায়িনী নদী হোক। আর তোমার এই কেশ সমূহ পূণ্য তুলসী বৃক্ষ রূপ ধারণ করে খ্যাতি লাভ করুক। তোমার পুষ্প ও পত্র সমূহ পূজায় প্রশস্ত বলে পরিগণিত হবে। গোলোকে বিরজা নদী তীরে, রাস মন্ডলে, বৃন্দাবনের ভূমিতে তথা বিভিন্ন পবিত্র স্থানে পুণ্যদায়ক তুলসী বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হোক। পুণ্যদায়ক ও পুণ্য দেশে তুলসী তরুমূলে সমস্ত তীর্থ সমূহের অধিষ্ঠান হবে। শাস্ত্র প্রমাণে-পৃথিবীতে সারে তিনকোটি তীর্থ আছে। তুলসী তরু মূলে সমস্ত তীর্থ বিরাজ করে। যে ব্যক্তি তুলসী পত্রের জলে অভিষিক্ত হবে সেই ব্যক্তি সমস্ত তীর্থে স্নান ও সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণের ফললাভ করবে। শ্রীহরিকে একটি মাত্র তুলসী পত্র দানে তাঁর যে সন্তোষ লাভ হয় সহস্র কলসী অমৃত দানে শ্রীহরির সে রূপ প্রীতি লাভ করেন না। মৃত্যুকালে তুলসী জলপান সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"তুলসী পত্র তোয়ঞ্চ মৃত্যুকালে চ যো লভেৎ।
স মুচ্যতে সর্বপাপাদ্ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।।
নিত্যং তুলসী তোয়ং ভুঙক্তে ভক্ত্যা চ মানবঃ।
স এব জীবন্মুক্তশ্চ গঙ্গাস্নানং ফলং লভেৎ।।

তুলসী পত্র মিশ্রিত জল মৃত্যুকালে পান করলে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করে। যিনি ভক্তি সহকারে নিত্য তুলসী মিশ্রিত জল পান করে সে গঙ্গা স্নান ফল লাভ করে ও সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত। যিনি দেহে তুলসী ধারণ করে তুলসী তীর্থে প্রাণত্যাগ করেন তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। যে মানবতুলসী ধারণ করে মিথ্যা সপথ করে বা স্বীকার রক্ষণ করে না সে মানব চন্দ্র সূর্যের স্থিতি কাল পর্যন্ত নরক ভোগ করে। তুলসী পত্র চয়ন সম্পর্কে বলা যায় যে,—

"পূর্ণিমায়ামমায়াঞ্চ দ্বাদশ্যাং রবিসংক্রমে।
তৈল ভ্যঙ্গে চ স্নানে চ মধ্যাহ্নে নিশি সন্ধ্যয়োঃ।।
অশৌচেহ শুচিকালে বা রাত্রি বাসোহন্বিতে নরাঃ।
তুলসীং যে চ বিচিন্ব তে ছিন্দন্তি হরেঃ শিরঃ।।

—ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রকৃতি খন্ড ২১/৫১-৫২

পূর্ণিমা, অমারস্যা, দ্বাদশী, রবিবার, সংক্রান্তী, স্নানের পূর্বে, তৈলমেখে, মধ্যাহ্ন কালে, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যায় অশৌচ কালে, অশুচি অবস্থায়, রাত্রিবাস বস্ত্রযুক্ত হয়ে যিনি তুলসী পত্র চয়ন করেন তিনি শ্রী হরির মস্তক ছেদন করেন। সতি তুলসী! তোমার পত্র বাসি হলেও সেই পত্র শ্রাদ্ধ, দান, ব্রতে শুদ্ধ বলে গণ্য হবে। তুলসী! তুমি স্বয়ং মহাসাধ্বী। তুমি আমার সন্নিধানে গোলোকে রাস মণ্ডলে বিহার করবে।

আবার ভগবান বিষ্ণু বললেন- তুলসী! আমি স্বয়ং গণ্ডকী নদীর তীরে তোমার অভিশাপে পর্বত রূপী হয়ে অবস্থান করব। সেই স্থানে বজ্রকীট নামক কীট সকল বজ্র তুল্য দন্ত্য দ্বারা সেই শিলার অভ্যন্তরে আমার চক্র রচনা করবে। যে শিলায় একটি মাত্র দ্বারে চারটি চক্র ও একটি বনমালা অঙ্কিত থাকবে, সেই নবমেঘ তুল্য কৃষ্ণবর্ণ শালগ্রাম শিলার নাম লক্ষ্মী- নারায়ণ। যে শিলার একদ্বারে চারি চক্র, নবীন মেঘ সদৃশ কৃষ্ণ-বর্ণ এবং বনমালা রহিত, সেই শিলার নাম লক্ষ্মী- জনার্দ্দন। যে শালগ্রামে দুটি দ্বার চার চক্র, গোষ্পদ- চিহ্ন যুক্ত এবং বনমালা রহিত সেই শিলার নাম রঘুনাথ। যে শিলা আকারে অতি ক্ষুদ্র দুটি চক্র চিহ্ন যুক্ত এবং নূতন জলধরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ তার নাম দধি বামন। এই শিলা গৃহস্থ গণের সুখপ্রদ। অতি ক্ষুদ্র দ্বিচক্র যুক্ত ও বনমালা ভূষিত শালগ্রাম শ্রীধর নামে খ্যাত। বৃহদাকার দ্বিচক্র বিশিষ্ট গোলাকার শিলা দামোদর নামে খ্যাত। মধ্যমা কৃতি সপ্তচক্র যুক্ত, ছত্র ও তৃণচিহ্ন যুক্ত শাল গ্রাম রাজরাজেশ্বর নামে খ্যাত। ইহা রাজ্য সম্পদ দান করে। চৌদ্দচক্র যুক্ত বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণ শালগ্রাম অনন্ত নামে খ্যাত। ইহা চর্তুবর্গ ফলযুক্ত। চক্রাকার, দ্বিচক্র বিশিষ্ট, শ্রীযুক্ত, মেঘবর্ণ ও গোষ্পদ চিহ্নিত মধ্যমাকৃতি শিলার নাম মধুসূদন। সুদর্শন চিহ্ন সহ যে শিলা মাত্র একটি চক্রযুক্ত এবং গুপ্ত চক্র বিশিষ্ট তাঁর নাম গদাধর। অতি বিস্তৃত বদন, দ্বিচক্র যুক্ত ও বিকট দর্শন শিলার নাম নরসিংহ। এর পূজনে গৃহীগণের সুখ প্রদান করে। যার দ্বারদেশে দুটি চক্র এবং শ্রীচিহ্ন সমান ও পরিস্ফুট, সেই চক্রের নাম বাসুদেব। ইনি কামনানুসারে সর্ববিধ ফল প্রদান করেন। নবমেঘ তুল্য বর্ণ, সূক্ষ্মচক্র যুক্ত এবং শিলার দ্বারদেশে বহু ছিদ্রযুক্ত চক্রের নাম প্রদ্যুম্ন। যে শিলায় পরস্পর সংলগ্ন দুটি চক্র এবং পৃষ্ঠদেশ অতি প্রশস্ত তার নাম সঙ্কর্ষণ। যে শিলা অতি

সুন্দর, পীতবর্ণ এবং গোলাকার তার নাম অনিরুদ্ধ শালগ্রাম শিলা। ইহা গৃহীগণের সুখপ্রদ।

যে স্থানে শালগ্রাম থাকে, সেস্থানে শ্রীহরি বিরাজিত থাকেন। সে স্থানেই লক্ষ্মীদেবী সমস্ত তীর্থ সমূহের সহিত বাস করেন। ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ সমূহ শালগ্রামশিলা পূজায় নষ্ট হয়। শালগ্রাম শিলা ছত্রাকার হলে রাজ্যলাভ হয়, বর্তুলাকার হলে দুঃখ হয়, শূলাগ্রতুল্য হলে অবশ্যই মৃত্যু লাভ হয়ে থাকে। বিকৃত বদন হলে দারিদ্র পিঙ্গলবর্ণ হলে হানি— সর্ব বিষয়ে ক্ষতি। বিদীর্ণ চক্র হলে অবশ্যই মৃত্যু হয়ে থাকে। ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা, শ্রাদ্ধ, দেবপূজা — এই সমস্ত কার্য শালগ্রাম শিলার অধিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হলে অতি মঙ্গল জনক ফল লাভ হয়। চারিবেদ পাঠে এবং সকল তপস্যায় অনুষ্ঠানে যে পুণ্য লাভ হয়, কেবল শালগ্রাম শিলা পূজা করলে সে পুণ্য লাভ হয়ে থাকে। যিনি শালগ্রাম শিলা স্নানজল নিত্য পান করেন সেই মানব মহা পবিত্র ও জীবন্মুক্ত মৃত্যুর পর হরি পদে গমন করেন। মৃত্যু কালে যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলা জল প্রাপ্ত হন তিনি পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করে যিনি মিথ্যালাপ করেন বা আজ্ঞাপালনে অস্বীকার করেন তিনি গভীর নরকে প্রবেশ করেন। যে ব্যক্তি শালগ্রাম হতে তুলসীপত্র বিযুক্ত করেন পরজন্মে তার স্ত্রী বিচ্ছেদ হয়। তুলসী, শালগ্রাম, এবং শঙ্খ যিনি একত্রে স্থাপন করেন তিনি শ্রীহরির প্রিয় হন। ভগবান বিষ্ণু একথা তুলসীকে বলে বিরত হন। তুলসী তখন নিজের দেহ ত্যাগ করে দিব্যরূপ ধারণ করলেন এবং বিষ্ণুর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করলেন। এদিকে তুলসীর সেই পরিত্যাক্ত দেহ হতে তৎক্ষণাৎ "গণ্ডকী" নামে এক নদী উৎপন্না হলো। এই গণ্ডকী নদীর তীরে শ্রীহরির অংশে মনুষ্যগণের পুণ্যজনক এক পর্বত উদ্ভূত হলো। তখন হতেই উক্ত পর্বতে বজ্রকীটগণ বহুবিধ শালগ্রাম শিলা রচনা করছে। তার মধ্যে যে শিলা সমূহ গণ্ডকী নদী জলে পতিত হয় সে সব শিলা মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়। আর সে সমস্ত শিলা স্থলেই থাকে সে সব শিলা সূর্যের তাপে পিঙ্গল বর্ণ হয়।

দেবর্ষি নারদ নারায়ণের কাছে তুলসীর ধ্যান, পূজা মন্ত্র ও স্তোত্র জানতে চাইলে নারায়ণ তা বর্ণনা করেন—

।। পাপ নাশন ধ্যান।।

"তুলসীং পুষ্পসারাঞ্চ সতীং পূজ্যাং মনোহরাম্।
কৃৎস্ন পাপেন্ধদাহায় জ্বলদগ্নি শিখোপমাম্।।
পুষ্পেষু তুলনাপ্যস্যা নাসীদ্ দেবীষু বা মুনে।
পবিত্র রূপা সর্বাসু তুলসী সা চ কীর্তিতা।।
শিরোধার্য্যাঞ্চ সর্বেসামীপ্সিতাং বিশ্বপাবনীম্।
জীবন্মুক্তাং মুক্তিদাঞ্চ ভজে তাং হরিভক্তিদাম্।।"

—ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রকৃতি খণ্ড ২২/৪২-৪৪

অনুবাদ ঃ— পুষ্প সারা, পূজনীয়া, মনোহরা, সতীসাধ্বী তুলসীদেবী সমস্ত পাপ সমূহরূপ কাষ্ঠ দাহের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিশিখাতুল্যা। হে মুনে! সমস্ত পুষ্প সমূহের মধ্যে এবং সমস্ত দেবীগণের মধ্যে এর কোন তুলনা নেই। সমস্ত দেবীগণের মধ্যে পবিত্র রূপা এই দেবীকে সেই কারণে তুলসী বলে বর্ণনা করা হয়। যিনি সকলের শিরোধার্যা ও প্রার্থনীয়া, জীবনমুক্তা, মুক্তদায়িনী এবং হরিভক্তি প্রদায়িনী আমি সেই বিশ্বপাবনী তুলসীদেবীকে ভজনা করি।

এক সময়ে সরস্বতী দেবী শ্রীমতী তুলসীর সাথে কলহ করলে শ্রীবিষ্ণুর সম্মুখেই তুলসী অন্তর্হিতা হন। বিষ্ণু তখন স্নান পূর্বক তুলসী বনে গমন করে উপরোক্ত তুলসীর ধ্যান করত তুলসী পত্রদ্বারা সতী তুলসীর পূজা করলেন। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, চন্দন, সিদুর, ঘৃত ও অন্যান্য উপাচার দ্বারা তুলসী পূজার বিধান। পূজামন্ত্রঃ—

"লক্ষ্মী-মায়া-কাম-বাণীবীজ পূর্বং দশাক্ষরম্।
বৃন্দাবনীতি ঙেন্তঞ্চ বহ্নিজায়ান্তমেব চ।।"

অনুবাদ ঃ— "লক্ষ্মী-মায়া-কাম-বাণী" এর বীজ চতুষ্টয়ের সাথে "বৃন্দাবন্যৈ

স্বাহা।" —এই দশাক্ষর মন্ত্র রাজের শ্রীহরি তুলসী পূজা করলেন। এই মন্ত্র দ্বারা যে মানব বিধান অনুসারে ভক্তি সহকারে তুলসীর পূজা করবেন, সেই মানব সর্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হবেন।

তারপর শ্রীহরি তুলসীর স্তব করলেন।

।। শ্রীতুলস্যষ্টকম্।।

"শ্রীভগবানুবাচ—

বৃন্দারূপাশ্চ বৃক্ষাশ্চ যদেকত্র ভবন্তি চ।
বিদুর্বুধাস্তেন বৃন্দাং মৎপ্রিয়াং তাং ভজাম্যহম্।। ১ ।।
পুরা বভুব যা দেবী হ্যাদৌ বৃন্দাবনে বনে।
তেন বৃন্দাবনী খ্যাতা তাং সৌভাগ্যাং ভজাম্যহম্।। ২ ।।
অসংখ্যেসু চ বিশ্বেষু পূজিতা যা নিরন্তরম্।
তেন বিশ্বপূজিতাখ্যাং জগৎপূজ্যা ভজাম্যহম্।। ৩ ।।
অসংখ্যানি চ বিশ্বানি পবিত্রাণি যয়া সদা।
তাং বিশ্বপাবনীং দেবীং বিরহেণ স্মরাম্যহম্ ।। ৪ ।।
দেবা ন তুষ্টাঃ পুষ্পানাং সমূহেন যয়া বিনা।
তাং পুষ্পসারাং শুদ্ধাঞ্চ দ্রষ্টুমিচ্ছামি শোকতঃ ।। ৫ ।।
বিশ্বে যৎপ্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্ত্যানন্দো ভবেৎ ধ্রুবম্।
নন্দিনী তেন বিখ্যাতা সা প্রীতা ভবিতা হি মে।। ৬ ।।
যস্যা দেব্যাস্তুল্যা নাস্তি বিশ্বেষু নিখিলেষু চ।
তুলসী তেন বিখ্যাতা তাং যামি শরণং প্রিয়াম্ ।। ৭ ।।
কৃষ্ণজীবন রূপা যা শশ্বৎ প্রিয়তমা সতী।
তেন কৃষ্ণ জীবনীতি মম রক্ষতু জীবনম্।। ৮ ।।

—ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রকৃতিখণ্ড ২২/১৯-২৫

অনুবাদঃ—

১। শ্রীভগবান বললেন—বৃন্দাকারে (বহুবাচী) যে বৃক্ষ সকল একত্রে উৎপন্ন হন বলে বুদ্ধিমানগণ থাকে "বৃন্দা" —এই নামে অবগত আছেন। আমার সেই প্রিয়া বৃন্দাকে আমি ভজন করি।। ১ ।।

২। পুরাকালে যে দেবী বৃন্দাবনের বনে বৃক্ষরূপে উৎপন্না হয়ে ছিলেন, সে হেতু যিনি "বৃন্দাবনী"— এই নামে খ্যাতি লাভ করেন, আমি সেই সৌভাগ্যবতী বৃন্দাদেবীর ভজন করি।

৩। যে দেবী অসংখ্য বিশ্বসমূহে পূজিতা হন, সে কারণে যিনি "বিশ্বপূজিতা" —এই নাম প্রাপ্ত হয়েছেন, আমি সে জগৎ পূজা দেবীকে ভজনা করি।

৪। যাঁর দ্বারা অসংখ্য বিশ্ব সমূহ সদা পবিত্র থাকে আমি সে "বিশ্ব পাবনী" নামা দেবীকে বিরহ কাতর হয়ে স্মরণ করি।

৫। দেবগণ যে তুলসী ব্যতীত অন্য পুষ্প দ্বারা তুষ্ট হন না, আমি সে শুদ্ধ "পুষ্পসারা" (সমস্ত পুষ্পের সার) দেবীকে শোকাকুল হয়ে দেখতে ইচ্ছা করি।

৬। বিশ্বমধ্যে যাঁকে লাভ করলে অবশ্যই ভক্তিযুক্ত আনন্দ লাভ হয়, সে হেতু যিনি "নন্দিনী" নামে খ্যাতা, সে তুলসী আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

৭। নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে দেবীর কোন তুলনা নেই সে হেতু যিনি "তুলসী" —এই নামে খ্যাতি লাভ করেছেন, আমি সে প্রিয়া সীর শরণ গ্রহণ করি।

৮। যে সতী সাধ্বী দেবী শ্রীকৃষ্ণের জীবন স্বরূপা, নিত্যা, প্রিয়তমা, সে কারণে যিনি "কৃষ্ণ ীবনী" নাম প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি আমার প্রাণ রক্ষা করুন।

শ্রীভগবান এরূপ স্তব করে তথায় অবস্থান করতে লাগলেন এবং তখনই দেখলেন সতী সাক্ষাৎ তুলসী বৃক্ষ হতে আবির্ভূতা হয়ে তাঁর চরণে প্রণাম করে শরণাপন্ন হলেন। তখন স্বয়ং ভগবান তুলসীকে "তুমি বিশ্বপূজ্যা হও" বলে বর প্রদান করলেন। এই বর প্রাপ্তা হয়ে তুলসী সন্তুষ্টা ও আনন্দিতা হলেন।

তুলসীর নামাষ্টক স্তোত্রের সংক্ষিপ্ত নামার্থঃ—

"বৃন্দাং বৃন্দাবনীং বিশ্বপাবনীং বিশ্বপূজিতাম্।
পুষ্পসারাং নন্দিনীঞ্চ তুলসীং কৃষ্ণজীবনীম্।।"

কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তুলসীদেবীর আবির্ভাব হয়। সে জন্য ভগবান শ্রীহরি স্বয়ং ঐ তিথিতে তুলসীর পূজা ব্যবস্থা করেছেন। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে পূর্ণিমায় তুলসীর বিশেষ পূজার অনুষ্ঠান করেন তিনি সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যিন নিত্য তুলসী সেবা করেন তিনি সমস্ত ক্লেশ মুক্ত হয়ে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করেন।

খ) তুলসী দেবীর আবির্ভাব (স্কন্দপুরাণ)

তুলসীদেবীর আবির্ভাব সম্পর্কে স্কন্দ পুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্মে বিশদ বর্ণনা আছে। নারদ মুনি পৃথু মহারাজকে বললেন—হে রাজন! আপনার প্রশ্নের উত্তরে তুলসীদেবীর আবির্ভাব সম্পর্কে বর্ণনা করব। এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণকে নিয়ে কৈলাসে শিবের দর্শনে গমন করেন। দেবরাজ ইন্দ্র শিবের গৃহসমীপে এক পুরুষকে দর্শন করে শিবের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ইন্দ্র বার বার জিজ্ঞাসা করলেও সেই পুরুষ কোন উত্তর দিলেন না। ইন্দ্র ক্রুধ হয়ে তাকে বজ্র দ্বারা প্রহার করেন। কিন্তু প্রহারে সেই পুরুষের কিছুই হলো না বরং বজ্র ভস্মীভূত হলো। এর পর রুদ্র স্বীয় তেজে সমস্তই যেন প্রজ্বলিত করলেন। এরূপ দর্শন করে বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে সত্বর ভূমিতে পতিত হয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করতে বললেন। বৃহস্পতি রুদ্রকে স্তব করে তাঁকে শান্ত করেন। বৃহস্পতি বললেন হে দেব! আপনি শরণাগত ইন্দ্রকে রক্ষা করুন। আপনার ললাটনেত্র সমুৎপন্ন অনল প্রশমিত করুন। শিব অনলরাশি প্রশমিত না করে তা সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন, যাতে ইন্দ্রের কোন পীড়া না জন্মে। ঐ অনল সাগরে পতিত হওয়া মাত্রই বালক রূপ প্রাপ্ত হয়ে রোদন করতে লাগল। রোদন ধ্বনিতে ধরণী কম্পিত হতে লাগল। ভীষণ রোদন ধ্বনি শ্রবণ করে ব্রহ্মা সেখানে আসেন। সমুদ্র বালককে ক্রোড়ে করে এসে ব্রহ্মাকে বললেন—এ বালক আমার

পুত্র, আপনি এর জাত কর্ম সম্পাদন করুন। সমুদ্র এরূপ বললে সেই পুত্র ব্রহ্মাকে ভ্রূমধ্যে ধারণ পূর্বক কম্পিত হলো, তখন ব্রহ্মাও কম্পিত হলে তাঁর নয়নদ্বয় হতে জল পতিত হলো। ব্রহ্মা বললেন— এ বালক আমার নয়ন জল নেত্রদ্বয়ে ধারণ করেছে—অতএব এ বালক জলন্ধর নামে বিখ্যাত হবে। জলন্ধর রুদ্র ভিন্ন অন্যের অবধ্য হবে। পরে জলন্ধর কালনেমি কন্যা বৃন্দাকে পত্নীরূপে লাভ করেন এবং পৃথিবী শাসন করেন।

এক সময় দৈত্যরাজ জলন্ধর রাহুকে ছিন্ন শিরা দেখে শুক্রের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। শুক্র রাহুর ছিন্ন শির হওয়া কারণ বলেন। জলন্ধর সমুদ্র মন্থনের কথা শুনে ভীষণ ক্রোধান্বিত হলেন। সমুদ্র মন্থনে প্রাপ্ত রত্নাদি দেবগণ কর্তৃক নীত হয়েছিল। একথা জলন্ধর শ্রবণ করে এক দূতকে দেবরাজ ইন্দ্র সমীপে পাঠান। দূত ইন্দ্র সমীপে গিয়ে সমুদ্র মন্থনের রত্নাদি জলন্ধরের জন্য প্রার্থনা করেন। ইন্দ্র রত্নাদি প্রাদন না করে ভীষণ বাক্য বলে দূতকে পাঠিয়ে দিলেন। দূত এসে ইন্দ্রের ভীষণ বাক্যাদি জলন্ধরকে জানালেন। জলন্ধর সৈন্য নিয়ে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করেন। দৈত্য ও দেবগণের মধ্যে অনেক দিন যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধে অনেক দেব ও দানব সৈন্য নিহত হলে একদিকে শুক্রাচার্য্যকে মৃতসঞ্জবনী সুধা প্রদান করে দানব সৈন্যগণকে জীবিত করলেন। পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে মৃত দেবগণকে সমুত্থিত হতে দেখে ক্রোধ পরবশ জলন্ধর শুক্রাচার্যকে বললেন যে, কিরূপে নিহত দেবগণ জীবিত হলো। সঞ্জবনী বিদ্যা তো একমাত্র আপনিই জানেন। শুক্র বললেন—বৃহস্পতি দ্রোণাদ্রি হতে দিব্য ঔষধি সকল আনয়ন পূর্বক দেবগণকে জীবিত করেছেন। জলন্ধর তখন দ্রোণ পর্বতকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। অনন্তর দেবগণকে যুদ্ধে নিহত হতে দেখে বৃহস্পতি দ্রোণ পর্বতের উদ্দেশ্যে গমন করলেন কিন্তু পুনরায় আর সেই পর্বতকে দেখতে পেলেন না। বৃহস্পতি জানতে পারলেন জলন্ধর দ্রোণ পর্বতকে অপহরণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে। বৃহস্পতি তখন দেবগণকে বললেন তোমরা জলন্ধরকে জয় করতে অসমর্থ। তখন দেবগণ পালায়ন করতে লাগলেন। দৈত্যগণ তখন দেবনগরীতে প্রবেশ করলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সুবর্ণ গিরির

গুহায় উপনীত হলো। সেখানে জলন্ধরকে আসতে দেখে দেবগণ বিষ্ণুর স্তব করেন। বিষ্ণু স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে তথায় গমন করতে উদ্যত হলেন, এবং কমলাকে বলতে লাগলেন—তোমার ভ্রাতা জলন্ধর দেবগণকে লাঞ্ছিত করেছে। তাই আমি যুদ্ধার্থে তথায় গমন করব। লক্ষ্মীদেবী বললেন— হে নাথ! আমি ভক্তি দ্বারা সতত আপনার সেবা করি, হে কৃপানিধে! তবে কিরূপে আমার ভ্রাতা জলন্ধর যুদ্ধে আপনার বধ্য হবে? ভগবান বিষ্ণু বললেন—হে দেবী! এই জলন্ধর রুদ্র ভিন্ন অন্যের অবধ্য। বিশেষতঃ তোমার প্রিয় কামনায় আমি একে বধ করব না। দেবগণ যেখানে স্তব করছিলেন ভগবান বিষ্ণু যুদ্ধার্থে সেখানে গমন করেন। বিষ্ণু এবং জলন্ধরের সাথে অনেকদিন যুদ্ধ হয়। এক সময় বিষ্ণু বললেন—হে দৈতেন্দ্র! তোমার বিক্রমে আমি প্রীত হয়েছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। জলন্ধর বললেন—যদি আমার প্রতি প্রীত থাকেন, তবে এই বর দান করুন যে, অদ্য আমার ভগিনী কমলা ও আপনার গণ সহ আমার গৃহে বাস করুন। বিষ্ণু বললেন "তাই হোক।" এই বলে বিষ্ণু স্বগণ সহ কমলাকে নিয়ে জলন্ধর গৃহে গমন করলেন।

এক সময় নারদ মুনি জলন্ধর গৃহে গমন করেন। দৈত্যেন্দ্র জলন্ধর তাঁকে যথাযোগ্য পূজাদি করে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। নারদ বললেন— হে দৈতেন্দ্র! আমি কৈলাসে শিব উমাকে দর্শন করেছি কিন্তু শিবের সমৃদ্ধি তোমার থেকে অধিক। বিশেষতঃ তোমরা সমৃদ্ধি তো স্ত্রীরত্ন বিহীন। পার্বতী রূপের সদৃশ কোন স্ত্রীলোক নেই। তুমি সকল রত্নের অধিকারী হলেও স্ত্রীরত্ন বিষয়ে শিবের সমৃদ্ধিই অধিক শ্রেষ্ঠ। নারদ মুনি একথা বলে গমন করলেন। নারদের মুখে এপ্রকার রমনীয় কথা শ্রবণ জলন্ধর অনঙ্গ জ্বরে পীড়িত হলো। বিষ্ণু মায়া মোহিত জলন্ধর রাহুকে দূতকরে কৈলাসে শিবের কাছে পাঠালেন। রাহু দ্বারে উপনীত হলে নন্দী রাহুকে শিব সমীপে আনয়ন করলেন। রাহু শিবকে বলতে লাগলেন—আমার প্রভু জলন্ধর নিখিল রত্নের অধীশ্বর। তার আদেশ শ্রবণ কর। তুমি শ্মশানে থাক, অস্থি ভার বহন করে থাক। পার্বতী কিরূপে তোমার পত্নী হতে পারেন। পার্বতী প্রভু জলন্ধরেরই যোগ্য। ভিক্ষাভোজী তুমি কখনো পার্বতীর যোগ্য নও। রাহু এভাবে বললে শিবের ভ্রূমধ্যে

হতে দ্বিতীয় নৃসিংহের ন্যায় এক পুরুষ আবির্ভূত হয়ে রাহুকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হলো। রাহু তখন শিবের কাছে ক্ষমা চাইলেন। তখন শিব ভয়ঙ্কর পুরুষকে রাহুভক্ষণ পরিত্যাগ করতে বললেন। রাহু জলন্ধর সমীপে এসে কৈলাসে সংঘটিত ঘটনা বলল। রাহুর বাক্য শ্রবণ করে জলন্ধর অতিবেগে যুদ্ধার্থ গমন করলেন। গমন করা কালীন তার মস্তক হতে মুকুট খসে ভূমিতে পড়ল। তিনি যুদ্ধ করার জন্য শিবাদি দেবগণ সমীপে চললেন। তার যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখে ইন্দ্রাদি দেবগণ শিবের কাছে গেলেন। শিব তখন বিষ্ণুর কাছে গেলেন। বিষ্ণুও দেবগণ স্ব স্ব তেজ শিবকে প্রদান করলেন। শিব স্বীয় তেজ পরিত্যাগ করে সমস্ত তেজ দ্বারা সুদর্শন নামক উত্তম চক্র প্রস্তুত করলেন। দেবগণেরও অসুর গণের বহুদিন যাবৎ ভীষণ যুদ্ধ চলল। এক সময় জলন্ধর শিবের রূপ ধরে পার্বতীর কাছে গেলে তার বীর্য্য পতিত হলো। পার্বতী জলন্ধকে মায়াবী বলে বুঝতে পেরে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে ঘটনা খুলে বললেন। বিষ্ণু তখন জলন্ধরের রূপ ধরে তার পত্নী বৃন্দার কাছে গমনের অভিলাষে তার পুরী মধ্যে প্রবেশ করলেন।

এদিকে বৃন্দা স্বপ্নে দর্শন করলেন যে, তার স্বামী জলন্ধর মহিষারূঢ়, তৈলাভ্যঙ্গ, কৃষ্ণকুসুমিত, রাক্ষণগণ সেবিত হয়ে দক্ষিণ দিকে গমন করছে এবং তার গৃহ সাগরে নিমগ্ন হয়েছে। স্বপ্নাবসানে জেগে উঠে দেখতে পেলেন সূর্য্য সছিদ্র হয়ে উদিত হয়েছেন এবং মাঝে মাঝে নিস্প্রভ হয়ে যেতেছেন। এই সকল অমঙ্গল দর্শনে বৃন্দা রোদন করতে লাগলেন। তিনি বনে ভ্রমণ করতে করতে দুটি রাক্ষস দেখতে পেলেন এবং ভয়ে পালায়ণ করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এক তপস্বীকে দেখতে পেলেন। তপস্বীকে বললেন আমাকে রক্ষা করুন। মুনি হুঙ্কার করলে রাক্ষসদ্বয় নিরস্ত হলো। বৃন্দা তপস্বী মুনিকে বললেন—হে প্রভো! আমার স্বামী দানবরাজ জলন্ধর। তিনি রুদ্ধের সহিত যুদ্ধ করছেন। তিনি সমর ভূমিতে এখন কেমন আছেন, আমাকে বলুন। বৃন্দার বাক্যে মুনি উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করলে দুটি বানর এল। মুনির নির্দেশে তারা গমন করল এবং একটি শির ও একটি ধর নিয়ে এসে তা মুনির সম্মুখে রেখে দিল। বৃন্দা স্বামী জলন্ধরের ধর ও শির দেখে স্বামী শোকে মুর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল।

মুনি তাকে কমণ্ডলু জলে অভিষিক্ত করে আশ্বস্ত করলেন। বৃন্দা আবার মুনিকে বললেন— হে কৃপানিধে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার স্বামীকে কৃপা করে জীবিত করুন। শিব একে যুদ্ধে নিহত করেছে। কেহ একে জীবিত করতে সমর্থ নয়। তবুও তোমার প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে আমি একে জীবিত করছি। এ কথা বলে মুনি অন্তর্হিত হলেন। এদিকে জলন্ধর জীবিত হয়ে বৃন্দাকে গ্রহণ করলেন। বহুদিন এভাবে বৃন্দা-জলন্ধরের অতিবাহিত হলো। অনন্তর একদা বৃন্দা জলন্ধরকে বিষ্ণুরূপে অবলোকন পূর্বক ভৎসনা করে বলতে লাগলেন—হে হরে! তোমরা চরিত্রে ধিক। তুমিই মায়া প্রচ্ছন্ন তাপস। তোমরা দ্বারদেশে যে দুজন রাক্ষস এরাই রাক্ষস রূপ ধারণ পূর্বক মায়া দ্বারা তোমরা পত্নীকে হরণ করবে। তুমি ভার্য্যা দুঃখে পীড়িত হয়ে বনে বনে ভ্রমণ করবে। এ কথা বলে বৃন্দা অনলে প্রবেশ করলেন। বিষ্ণু বৃন্দার ভস্মরজো দ্বারা শরীর আবৃত করে সেই স্থানে অবস্থান করতে লাগলেন।

এদিকে জলন্ধর রুদ্রকে মোহিত করার অভিপ্রায়ে মায়া দ্বারা এক পার্বতীর মূর্তি নির্মাণ করে রথের উপর বন্ধন করে রাখলেন। শিব দেখলেন পার্বতী রোদন করছে, নিশুম্ভাদি দানবগণ তাকে প্রহার করছে। শিব এদৃশ্য দেখে উদ্বিগ্ন হলেন। বিষ্ণু কর্তৃক প্রবুদ্ধ হয়ে শিব বুঝতে পারলেন যে, এ দৃশ্য জলন্ধরের মায়া। শিব ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে শুম্ভ-নিশুম্ভকে অভিশাপ দিলেন— তোমরা পার্বতীর হাতে নিহত হবে। এদিকে জলন্ধর শর বর্ষণ করে ভূতলকে আচ্ছন্ন করল এবং বৃষভকে ব্যথিত করতে লাগল। অনন্তর রুদ্র অতিশয় ক্রুধ হয়ে রৌদ্র মূর্তি ধারণ করে প্রচণ্ডবেগে আদিত্য কান্তি সুদর্শন চক্রনিক্ষেপ করলেন। ঐ চক্র আকাশ মণ্ডল প্রজ্জ্বলিত করে বেগভরে ভূমিতলে পতিত হলো এবং জলন্ধরের অতি আয়াত লোচন মস্তক কায় হতে অপহরণ করল। তারপর নাদ করতে করতে রথ হতে তার মস্তক ভূতলে পতিত হলো। তার দেহ হতে একটি তেজ নির্গত হয়ে রুদ্রে মিশে গেল। ব্রহ্মাদি দেবগণ বিষ্ণুব কার্য্যের খুব প্রশংসা করলেন। দেবগণ শিবকে বললেন—আপনি অসুর ভয় হতে দেবগণকে রক্ষা করলেন। কিন্তু আর একটি অদ্ভুত ব্যপার এই যে, বৃন্দার লাবণ্যে মোহিত হয়ে বিষ্ণু বৃন্দার ভস্মরাশি দ্বারা শরীর আবৃত করেছেন। শিব বললেন হে দেবগণ! তোমরা

মূল প্রকৃতি মোহিনী মায়ার শরণ নাও। তিনি তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে দিবেন। দেবগণ মূল প্রকৃতির স্তব করে তাকে সন্তুষ্ট করলেন। দেবগণের স্তবে সন্তুষ্টা মূল প্রকৃতিদেবী আকাশে এক তেজমণ্ডল রূপে দর্শন দিলেন। সেই তেজ মধ্য হতে এক বাণী দেবগণ শ্রবণ করলেন। সেই বাণীই মূল প্রকৃতি শক্তি। শক্তি বললেন—আমি গৌরী-লক্ষ্মী-সরস্বতী এই রূপত্রয়, তোমরা লক্ষ্মী সরস্বতী-গৌরী সমীপে গমন কর। তোমাদরে কার্য সিদ্ধ হবে।

এই কথা বলে শক্তি অন্তর্ধান করলেন। তারপর দেবগণ লক্ষ্মী-সরস্বতী ও গৌরীর কাছে এসে প্রণাম করে ঘটনা খুলে বললেন। ঐ দেবীত্রয় দেবগণকে অনেকগুলি বীজ প্রদান করলেন এবং বললেন যেখানে বিষ্ণু বৃন্দার ভস্মলিপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন সেখানে গিয়ে এই বীজ সকল বপন কর। তাহলে তোমাদের আশা কৃতকার্য হবে। অনন্তর সুরগণ বীজ গ্রহণ করে বৃন্দা দগ্ধীভূত ভূমিতে বীজ বপন করলেন। সেই বীজ হতে তুলসী উৎপন্ন হলো। বিষ্ণু বৃন্দা হতেও তুলসীকে অধিক রূপশালিনী দর্শন করে তাকে প্রার্থনা করলেন। তুলসী অনুরাগ ভরে বিষ্ণুকে অবলোকন করলেন। তুলসী বিষ্ণুর প্রতি অধিক প্রীতিপ্রদ হলেন। ভগবান বিষ্ণু তুলসীকে নিয়ে আনন্দ চিত্তে বৈকুণ্ঠে গমন করলেন।

গ) তুলসী দেবীর আবির্ভাব (বৃহৎ ধর্মপুরাণ)

শ্রীবৃহৎ ধর্ম পুরাণে শ্রীল সূত- শৌনক সংবাদে তুলসী দেবীর আবির্ভবের বর্ণনা রয়েছে। প্রাচীন কালে কৈলাস শিখরে ধর্মদেব নামে একজন বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তার বৃন্দা নামে এক সতী সাধ্বী পতিব্রতা পত্নী ছিলেন। সতী বৃন্দা স্বামীর আদেশে দেব সেবার কার্য করতেন। সেই সতী সর্বদা স্মিতমুখী তপো- বিনয় সম্পন্না তথা সর্ব বিষয়ে সুলক্ষণ যুক্তা ছিলেন। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

সতত কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ ধর্মদেব শ্রীকৃষ্ণের নাম- গুণ- কীর্তণ করে সর্বত্র পর্যটন করতেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় সুনিপুণ এবং সাধুজনের সম্মানীয় ছিলেন। এক সময়

ধর্মদেব সাধু সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করতঃ গৃহে ভোজনের সময় অতিক্রান্তঃ করে ফেললেন। এদিকে তদীয় ভার্য্যা বৃন্দা গৃহে সমাগত সেবাদি করে স্বামীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও স্বামী ধর্মদেব গৃহে এলেন না। বৃন্দা ক্ষুধা- তৃষ্ণায় কাতরা হয়ে একটু জলপান করলেন। হঠাৎ ধর্মদেব গৃহে প্রবেশ করলেন। এসে দেখলেন পত্নী বৃন্দা জলপান করছে। ধর্মদেব হঠাৎ রেগে সাধ্বী পত্নী বৃন্দাকে "রাক্ষসী হও"- এই বলে অভিশাপ দিলেন। স্বামী ধর্মদেবের অভিশাপে বৃন্দা রাক্ষসী হয়ে কৈলাস পর্বতে বিচরণ করতে লাগলেন।

পরে বৃন্দা পৃথিবী তলে এসে ক্ষুধা পীড়ায় কাতরা হয়ে সক্রোধে বনে বনে জীব-জন্তু ভোজন করতে লাগলেন। পূর্ব ধর্ম সংস্কার বশে বৃন্দা ব্রাহ্মণ- বৈষ্ণব- শৈব ও গো- জাতিকে পরিত্যাগ করেছিলেন। কোন এক সময় কৈলাস ধামের কথা মনে হওয়ায় তথায় যেতে অভিলাষ করলেন। ত্রিরাত্র অনাহারে থেকে বৃন্দা কৈলাসে এলেন। সেখানে এসে ভোজনের জন্য ভাবতে লাগলেন। কৈলাসে সকল প্রাণীই শৈব আর ব্রাহ্মণের তো স্বভাবতই অভক্ষ্য অতএব, আমি কার প্রতি দণ্ড প্রহার করব? এখানে বৃক্ষ সকলও শিবময়, সুতরাং অভক্ষ্য। চিন্তাকুলা রাক্ষসী রূপিণী বৃন্দাকে কৈলাসে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা বলাবলি করতে লাগল,- এই বৃন্দা সতী সাধ্বী, পতিব্রতা, গুণ শালিণী এবং দোষ বর্জ্জিতা ছিলেন কিন্তু সামান্য কারণে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব দৈবই পরম বল। পূর্বকৃত সুকৃতি প্রাপ্তা এবং ধর্ম পরায়ণা এই বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ ও কৃষ্ণ নামাঙ্কিতা দেহলাভ পূর্বক অবশ্যই মুক্তি লাভ করবে।— —"শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য নামানি লব্ধা নামময়ীং তনুম্।"— এই বাক্য উচ্চারণ করে সেই ব্রাহ্মণেরা উচ্চ শব্দে সর্ব পাপহারী শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করতে লাগলেন। রাক্ষসী রূপিনী বৃন্দা সেই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সতত শ্রবণ করতে লাগলেন। বৃন্দা ক্ষুধা- তৃষ্ণায় কাতরা হয়ে যেখানে যেখানে যেতে লাগলেন- সেখানে সেখানে সততই শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্তন শুনতে পেলেন। বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ ও সপ্তাহ উপবাস করে কৈলাস পর্বতে দেহ ত্যাগ করলেন।

অনন্তর এক বছর অতীত হলে মহাদেব সতীসহ বনশোভা দর্শন করে বিচরণ

করতে লাগলেন। মহাদেব এক সরোবর তীরে মৃতা এক রমনীকে দেখতে পেলেন। তখন মহাদেব পার্বতীকে বললেন- পার্বতী! এই রমনী রাক্ষসী রূপিণী বৃন্দা। বৃন্দা পূর্বে কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণের ভার্য্যা ও পরম বৈষ্ণবী ছিলেন। এক বছর হলো দৈব বশতঃ রাক্ষসী বৃন্দা মারা গিয়েছে কিন্তু তার দেহ এখনো নষ্ট হয়নি। তার পূর্ব কান্তিঃ... এখনো বর্তমান আছে। এ কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির ও কৃষ্ণ নাম শ্রবণের মাহাত্ম্য। বৃন্দার সম্পূর্ণ দেহে দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণু মন্ত্র অঙ্কিত। শিব ভক্তেরা সহর্ষে সেই মন্ত্র পাঠ করল এবং তার শরীর স্পর্শ করল। স্পর্শ মাত্রেই তার দেহ খণ্ডখণ্ড হয়ে দীপ্তি পেতে লাগল। তার প্রতি খণ্ডে- "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।"- এই দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণু মন্ত্র উজ্জ্বলরূপে বর্তমান ছিল। তার সেই মন্ত্রের প্রতি বর্ণের গর্ভে বিষ্ণুর সহস্র নাম শোভিত ছিল। এই রাক্ষসী বৃন্দা ধর্মদেবের বনিতা, মহা বৈষ্ণবী। অভিশপ্তা হয়ে রাক্ষস দেহ ধারণ করেও ব্রাহ্মণ- বৈষ্ণব হিংসা করেনি। এর দেহ বৃথা হওয়া উচিৎ নয়, বৃন্দা- বৃক্ষ হয়ে ভূতলে বিষ্ণু প্রীতি সম্পাদন করুক। শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে এর দেহ প্রীতির উদ্দেশ্যে এর দেহ রোপিত হোক। শ্রীহরি বৃক্ষরূপিণী বৃন্দার পত্রে যে- রূপ পূজিত হবেন, মনি- কাঞ্চনাদি দ্বারা সে রূপ পূজিত হবেন না।

এই বৃক্ষের নাম হোক তুলসী। তুলসী পবিত্র, পাবনী'ত- কার শব্দে মরণ, উ- কার শব্দে যোগ। মৃতা হয়েও যিনি লসী। লস্- ধাতুর অর্থ কান্তি অর্থাৎ মৃতা হয়েও যিনি কান্তিমতী। তাই কান্তি মতী থাকাতে এর নাম তুলসী নামেই কীর্তিত হবে। তুলসীর প্রতি পত্রে দ্বাদশাক্ষ বিষ্ণু মন্ত্র অবস্থিত। এর উপাস্য নারায়ণ।

এদিকে দ্বিজ ধর্মদেব পত্নী বৃন্দার বিষয় মনে করে শোকে মলিন ও ক্ষীণ হয়েছিলেন। তিনি এই সময় "বৃন্দা" "বৃন্দা" বলে রোদন করতঃ তথায় এসে উপস্থিত হলেন। প্রিয়ে! কান্তে! বৃন্দে! কোথায় তুমি? আমি অতি নিষ্ঠুর হৃদয়, তুমি নির্দোষা তথাপি আমি তোমাকে শাপ দিয়েছি। আমাকে ধিক! এই ভাবে অনুতাপ করে ধর্মদেব রোদন করতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে মহাদেব তাকে সান্ত্বনা দিলেন।

দ্বিজ ধর্মদের শিবকে বললেন- আমার প্রিয়া যদি নারায়ণের জন্য তুলসী বৃক্ষ

হয়, তা হলে আমি যেন প্রিয়ার প্রীতি কামনায় এই তুলসীবৃক্ষের মূল হই। শিব বললেন—"তথাস্তু।" শিব ভক্তেরা শিবের আদেশে ব্রজমণ্ডলে এসে উত্তম কালিন্দী তটে বৃন্দা দেহ রোপণ করলেন। যথায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি গিরিরাজ গোবর্দ্ধন বিরাজমান সেই যমুনা তট প্রদেশ বৃন্দাবন নামে অভিহিত। সেই স্থান পরম শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিসম্পাদক। এই বৃন্দাবন ত্রিলোক মধ্যে গোপনীয়। এই ভাবে পৃথিবীতে বৃন্দা দেহ রোপণ করে শিব ভক্তেরা কৈলাসে চলে গেলেন। বৃন্দাদেহ হতে কার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে প্রাতঃকালে তুলসীদেবী আবির্ভূতা হন।

শ্রীমতী তুলসীদেবী আবির্ভূতা হলে নারায়ণ ও শিব এসে তুলসীকে দর্শন করলেন। তুলসীদেবীও নারায়ণকে দর্শন করে তাঁর স্তব করলেন —

"ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং নারায়ণ জগৎপতে।
কেবলানু ভবানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর।।
কংসারে মহেশায় কেশবায় নমোঽস্তু তে।
হরয়ে নরসিংহায় শ্রীকান্তায় নমো নমঃ।।

এই রূপ স্তবকারিনী তুলসীদেবীকে শ্রীবিষ্ণু শিব সমীপে গুণ- কীর্তন করে মহিমা বর্ণনা করলেন। শ্রীবিষ্ণু বললেন- হে শ্রীমতী তুলসী! হে বৃন্দাবন প্রিয়ে! হে বৃন্দে! তুমি আমার প্রীতি সম্পাদনের জন্য পৃথিবীতে অবস্থান কর। দেবগণ, মানবগণ তোমায় পূজা বন্দনাদি করবে। আজ হতে তোমার পত্র ব্যতীত আমার পূজা হবে না। একদিকে সর্বপুষ্প অলঙ্কার, নৈবেদ্য আর একদিকে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র বিশিষ্ট একটি পত্র।

"স্থিত ঃ প্রতিদলেষ্বস্যা মন্ত্রো দ্বাদশবর্ণক ঃ।
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়েতি মহাফলম্।।
মন্ত্রস্য প্রতিবর্ণস্য গর্ভে নাম সহস্রকম্।"

অনুবাদঃ— তুলসীর প্রতি পত্রে দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র অবস্থিত (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়)। উক্ত মন্ত্রের প্রতি বর্ণের গর্ভে বিষ্ণুর সহস্র নাম অবস্থিত।

সে ব্যক্তি তোমাকে প্রদক্ষিণ করে দন্ডবৎ প্রণামাদি করবে তার সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হবে। শ্রাদ্ধ, তর্পন, দান, ভোগ নিবেদন প্রভৃতি তোমার পত্র ব্যতীত ফল দায়ক হবে না। তোমার পত্র দ্বারা আমাকে পূজা করলে সকল দেবতাই তুষ্ট হবে। তোমার একটি পত্র দ্বারা কার্তিক মাসে আমাকে পূজা করলে সহস্র গোদানের ফল হবে। বৈশাখ মাসে পত্র দ্বারা শয্যা রচনা করলে তাকে আত্মাদান করি। আমাকে আষাঢ় মাসে পত্র রস বাসিত জল প্রদান করলে তার পুর্নজন্ম হয় না। যে মানব তদীয় পত্র রসে সিক্ত অন্ন ভোজন করে তা অমৃত বলে কথিত হয়। যে ব্যক্তি তুলসী পত্র স্পর্শ করে মিথ্যা কথা বলে বহু কোটি কল্পেও তার নরক হতে উদ্ধার হয় না। যিনি তুলসী কাষ্ঠ মালা বা অনুলেপন ধারণ করেন আমি তার নিকটেই থাকি। এই ভাবে তুলসী মহিমা বর্ণনা করে, তাঁকে পৃথিবীতে অভিষিক্ত করে শিবাদি সহ ভগবান বিষ্ণু অন্তর্ধান হন। গঙ্গা যেমন স্বর্গ- মত্য- বৈকুণ্ঠে বিরাজমান, তুলসী দেবীও সে ভাবে সর্বলোকেই বিরাজমান।

।। তৃতীয় মঞ্জরী।।

ক) তুলসীদেবীর দর্শন রহস্য ঃ—

ভগবান শ্রীবিষ্ণু, শিবাদির প্রীতি সম্পাদনী শ্রীমতী তুলসীদেবী দামোদর প্রিয় কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে প্রাতঃকালে ভূতলে আবির্ভূতা হন। শ্রীমতী তুলসীদেবী ভূতলে আবির্ভূতা হয়ে বৃক্ষরূপে গোচরীভূত হলেন। "বৃহৎ ধর্ম পুরাণে পূর্বখন্ডে" অষ্টম অধ্যায়ে বলা হয়েছে —

"প্রাদুর্ভূতে তরৌ তস্মিন্ দেবো নারায়ণ প্রভুঃ।
আজগাম মহেশেন দদর্শ তুলসীং ভুবি।।
মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং স্কন্ধ পল্লব শোভিতাম্।
দলৈরসংখ্যৈঃ সম্পূর্ণাং মহামন্ত্র ময়ীং স্থিরাম।।
জ্বলন্তীং স্বেন মহসা গন্ধামোদিত দিঙ্মুখাম।"

— বৃ.ধ.পু.পূ. ৮/২-৩

অনুবাদঃ— শ্রীমতী তুলসীদেবী প্রথমে তুলসী বৃক্ষরূপা হয়ে প্রাদুর্ভূত হলে প্রভু নারায়ণ এবং শিব ভূতলে এসে তুলসী বৃক্ষ দর্শন করলেন। প্রথমে দেখলেন- তুলসী মহামেঘের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণা, স্কন্ধ পল্লবে সুশোভিতা, অসংখ্য পত্র পূর্ণা, মহামন্ত্রময়ী এবং স্থিরা। তুলসীদেবী মসৃণতা, জ্যোতিতে জাজ্বল্যমানা, এবং সৌরভ দ্বারা চতুর্দিক আমোদিত করে বিরাজ করছেন। এরূপ দৃশ্য দেখে বিষ্ণু এবং শিব খুব আনন্দিত হলেন।

অনন্তর, শ্রীমতী তুলসীদেবী মূর্তিমতী হয়ে গোচরীভূতা হলেন। এ সম্পর্কে উক্ত পুরাণে বলা হয়েছে যে,

"ততো মূর্তিমতী দেবী বভূব তুলসী শুভা।

শ্যামাঙ্গী চারুবদনা দ্বিভুজা স্মিত ভাষিণী।।
শঙ্খপদ্ম করা শ্বেতবসনা যুবতী সতী।
নানালঙ্কার ভূষাঢ্যা সিন্দুরারুণ মালিকা।।"

— বৃ.ধ.পু.পূ. ৮/৪-৬

অনুবাদঃ— কল্যাণী শ্রীমতী তুলসীদেবী বৃক্ষ রূপে দর্শনের পরেই আবার মূর্তিমতী বিগ্রহ রূপে দর্শন দিলেন। তখন তিনি শ্যামাঙ্গী, সুন্দরমুখ কমল, দুই হস্ত বিশিষ্ট এবং মৃদুহাস্য পূর্বক কথা বলার প্রবণতা যুক্তা। তাঁর হস্তে শঙ্খ ও পদ্ম, পরিধানে শ্বেতবস্ত্র, নানা প্রকার অলঙ্কারে তিনি সুসজ্জিতা, তিনি সতী সাধ্বী যুবতী, তাঁর ললাটে অরুণ বর্ণ সিঁদুর। এভাবে ভগবান বিষ্ণু এবং শিব প্রথমে বৃক্ষরূপে, তারপরে মূর্তিমতী রূপে তুলসীকে দর্শন করলেন।

খ) তুলসী কথা কীর্তন পাপ বিনাশিণী ঃ—

অতি প্রাচীন কালে কাশ্মীর দেশে হরিমেধা ও সুমেধা নামে দুইজন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। এক সময় ঐ ব্রাহ্মণদ্বয় তীর্থ যাত্রায় গমন কালে পথে এক তুলসী কানন দেখতে পান। দ্বিজ সুমেধা তুলসী কানন দর্শন করে প্রণাম প্রদক্ষিণ করলেন। হরিমেধা বললেন- আপনি এত শ্রেষ্ঠদের, তীর্থ, ও ব্রাহ্মণ থাকতে কেন তুলসী কাননকে প্রণাম প্রদিক্ষণ করলেন। সুমেধা বললেন- ঐ বট বৃক্ষের ছায়ায় চলুন আমি আপনার কাছে তুলসীর কথা কীর্তন করব। বট বৃক্ষ ছায়ায় উপবেশন করে সুমেধা তুলসী মাহাত্ম্য বলতে লাগলেন।

প্রাচীন কালে দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র হতশ্রী হলে দেব- দানবগণ ক্ষীর সাগ মন্থন করেন। মথিত সাগর হতে কল্প বৃক্ষ, চন্দ্র, কমলাদেবী, ধন্বন্তরী উৎপন্ন হ অনন্তর অমৃত কলস উৎপন্ন হলে বিষ্ণু তা হস্তদ্বারা গ্রহণ পূর্বক দর্শন করে আনন্দি হন। তাঁর আনন্দাশ্রুবিন্দু সকল অমৃত কলসে পতিত হয় এবং মণ্ডলাকারে তুল

বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব সুলক্ষণ সম্পন্না সর্বাভরণে ভূষিতা তুলসীদেবীকে বিষ্ণুর হাতে অর্পণ করেন। ভগবান বিষ্ণুও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। তদবধি তুলসীদেবী জগতে বিষ্ণুবৎ পূজিতা হন। ভগবান বিষ্ণু জগতের মঙ্গলকর্তা এবং তুলসী তারই প্রিয়া। এ জন্য আমি তাকে প্রণাম- প্রদক্ষিণ করেছি।

দ্বিজ সুমেধা এ ভাবে তুলসী মাহাত্ম্য কীর্তন করলে অদূরে এক দিব্য বিমান এলো এবং বট বৃক্ষও পতিত হলো। সেই পতিত বট বৃক্ষ হতে দু'জন দিব্য পুরুষ এসে সুমেধা ও হরিমেধাকে প্রণাম করলেন। সুমেধা ও হরিমেধা দিব্য পুরুষদ্বয়কে প্রশ্ন করলেন- আপনারা দু'জন কে কে? পুরুষদ্বয়ের মধ্যে একজন বলল- আমার নাম আস্তিক আমার বাসস্থান দেবলোকে। আমি এক সময় নন্দন বনে অপসরার সঙ্গে বিচরণ করছিলাম। তৎপার্শ্বে লোমশ মুনি তপস্যা রত ছিলেন। তিনি আমার ব্যবহারে ক্রোধান্বিত হয়ে শাপ দেন- "তুমি ব্রহ্ম রাক্ষস" হয়ে বটবৃক্ষে বিচরণ কর। আমি তখন বিবিধ বিনয়ে ঋষিকে প্রসন্ন করলে তিনি আমার প্রতি শাপ বিমোক্ষণ বাণী প্রয়োগ করে বললেন-" তুমি যখন দ্বিজ মুখে তুলসী মাহাত্ম্য ও বিষ্ণুর নাম শ্রবণ করবে- তখন শাপ মুক্ত হবে। এরূপে আমি মুনি কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে দীর্ঘকাল এই বটবৃক্ষে বাস করছিলাম, দৈবাৎ আপনাদের মুখে তুলসী মাহাত্ম্য শ্রবণ করে শাপ মুক্ত হলাম। আমার সঙ্গী এই দ্বিতীয় পুরুষটি গুরু আদেশ অনাদর করে ব্রহ্ম রাক্ষস হয়েছে। ইনিও আপনাদের অনুগ্রহে শাপ মুক্ত হলেন। আপনাদের তীর্থ যাত্রা ফল এই স্থানেই সাধিত হলো। পরন্তু আপনাদের ভক্তি অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। তারপর সেই দিব্য পুরুষদ্বয় হরিমেধা ও সুমেধাকে প্রণাম করে নিজ ধামে গমন করলেন।

গ) শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীদের তুলসী মহিমা কীর্তন—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩০/৯) রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান হলে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে রত ছিলেন। বনমধ্যে তুলসীবৃক্ষ দর্শন করে গোপীগণের উক্তিঃ—

"কচ্চিত্তুলসী কল্যাণী গোবিন্দ চরণ প্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্ট স্তেঽতি প্রিয়োঽচ্যুতঃ।।"

অনুবাদঃ— গোপীগণ বললেন- হে গোবিন্দ চরণ প্রিয়া তুলসী! তুমি অলিকুল ব্যাপ্তা হলেও তোমার অতি প্রিয় অচ্যুত তোমাকে ধারণ করে থাকেন। তিনি কোন পথে গিয়েছেন, তুমি দেখেছ কি? তাঁর প্রাপ্তির পথ আমাদের দেখিয়ে দাও।

শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াগোপী রাসলীলায় অন্তর্ধান প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে উন্মাদিনীর ন্যায় বনে বনে পরিভ্রমণ করতে করতে এক তুলসী কানন দেখতে পেয়ে তার নিকটে গিয়ে বললেন— হে তুলসী! তুমি জগতের মঙ্গল কারিণী এবং গোবিন্দ চরণ প্রিয়া। তোমার ন্যায় মঙ্গল কারিণী জগতে আর কেহ নেই। তাই আমরা তোমার শরণাগত হলাম, তুমি আমাদের মঙ্গল বিধান কর। আমরা কৃষ্ণকে হারিয়ে বনে বনে ঘুরছি। কৃপা করে তুমি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য করে দিয়ে আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

হে তুলসী! তোমার ন্যায় ভাগ্যবতী আর কেহ নেই। তুমি গোবিন্দ চরণের অতি প্রিয়, সেজন্য তিনি কখনো তোমাকে চরণ ছাড়া করেন না। আর গোবিন্দ চরণও তোমার এত প্রিয় যে, তুমিও কখনো গোবিন্দ চরণ পরিত্যাগ কর না। গোবিন্দ চরণের সহিত যাদের সম্বন্ধ থাকে তারা সকলেই দয়ালু ও পরোপকারী হয়। আমরা সেই ভরসাতেই তোমার কাছে এসেছি। তুমি শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান বলে দিয়ে আমাদের প্রাণ রক্ষা কর।

আমাদের কৃষ্ণও "নারায়ণ সমগুণৈঃ" —

নারায়ণ তুল্য গুণশালী। সেজন্যই তিনি তোমাকে ভালবাসেন এবং তুমিও তাঁকে ভালবাস। তোমার মঞ্জরীর সদ্‌গন্ধে ভ্রমণ কুল আকুল হয়ে নিরন্তর তোমার মঞ্জরীতেই বাস করে থাকে। কিন্তু আমাদের কৃষ্ণ তোমাকে এতই ভালবাসেন যে, তিনি অলিকুল সঙ্কুল মঞ্জরী নিয়ে বনমালা তৈরী করে তাঁর বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন।

হে ভাগ্যবতী তুলসী! তোমার অচ্যুতের খবর তুমি নিশ্চই জান। তিনি এখন

কোথায় আছেন তা আমাদের বলে দিয়ে জীবন রক্ষা কর। আমরা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে এতই অধীর হয়েছি যে, আমাদের তাঁকে অন্বেষণ করার শক্তি নেই। শ্রীকৃষ্ণ এখন গুঞ্জয়মান ভ্রমর ব্যাপ্ত তুলসী মঞ্জরীর মালা ধারণ করে আছেন। তিনি যদি কোথাও লুকায়িথ থাকেন,তা হলে ভ্রমর গুঞ্জনের শব্দে তার উদ্দেশ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা তাঁর বিরহ বেদনায় এতই বিমনস্কা যে, আমাদের আর সেই গুঞ্জনের শব্দ ধারণ করার শক্তি নেই। অতএত, হে জগৎ মঙ্গল গোবিন্দ চরণ প্রিয়া তুলসী! আমরা তোমার নিকট করজোরে প্রার্থনা করি তুমি শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা কর।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

।। চতুর্থ মঞ্জরী।।

(ক) ।। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তুলসী সমীপে সংখ্যানাম গ্রহণ।।

শ্রীকৃষ্ণ নাম প্রচারের জনক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব "তুলসী দেবীর সম্মুখে" হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংখ্যা রক্ষণ পূর্বক ভজনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভক্তি জননী তুলসী দেবীর সম্মুখে "হরে কৃষ্ণ" নাম জপের অনুশীলনে ভজনে দ্রুত উন্নতি সাধন করা যায়। এই আদর্শ মহাপ্রভু আচরণ করে আমাদের কলিহত জীবদের শিক্ষাপ্রদান করেছেন। মহাপ্রভু এ প্রসঙ্গে বলেছেন"—

'আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সবারে।"(চৈ,চ,আ, ৩/১৮) মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ নাম ভজনের উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন নাই। পরন্তু সাধক ভক্তের ন্যায় নিজে জীবনে আচরণ করে ও সাধক জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু আবার বলেছেন—

'আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।" (চৈ,চ,আ, ৩/১৯) অর্থাৎ নিজে আচরণ না করে, জীবের সাক্ষাতে একটা আদর্শ স্থাপন না করলে কেবল মৌখিক উপদেশ দ্বারা ভজন শিক্ষা দেওয়া যায় না। কারণ, কেবল মুখের উপদেশ শুনে ভজনে অনবিজ্ঞ জীব যথাযথ ভাবে ভজনে প্রবৃত্ত হতে পারে না। তাই মহাপ্রভু —

'আপনি আচারি ভক্তি করিল প্রচার। (চৈ,চ,আ, ৪/৩৭) ভক্তভাবে ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান করে মহাপ্রভু ভক্তি ধর্মের প্রচার করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন এবং নিজেও আচরণ করে কৃষ্ণ নাম ভজনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তুলসী দেবীর সমীপে কি ভাবে ভজন করতে হয় মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ভাবে আচরণ করে তার গুরুত্ব প্রদর্শন করেছেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত "শ্রীচৈতন্য ভাগবতে" অন্ত্য লীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে তুলসীর সম্মুখে মহাপ্রভুর শ্রীনাম ভজন সম্পর্কে বলেছেন —

"তুলসী ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যে রূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া।।

ক্ষুদ্র এক ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া।।
প্রভু বোলে-"মুঞি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসো যেন মৎস্য বিনে জলে।।"
যবে চলে সংখ্যা নাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লৈয়া অগ্রে চলে একজন।।
পথে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
বহয়ে আনন্দধারা সর্বাঙ্গ বহিয়া।।
সংখ্যা নাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই থোয়েন তুলসীরে প্রভু পাশে।।
তুলসীরে দেখেন, লয়েন সংখ্যা নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন।।
পুনঃ সেই সংখ্যা নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর অগ্রে তুলসী দেখিয়া।।
শিক্ষা গুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
ইহা সেই মানয়ে' সেই জন পায় রক্ষা।।'

চৈ- ভা- অন্ত্য- ৩/১৫১- ১৬১

আলোচ্য প্রসঙ্গে মহাপ্রভু সংখ্যা নাম করে আস্বাদন করলেন। "আপনি আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে"(চৈচ মধ্য ২৫/২১৬)। মহাপ্রভু ভজন করে নিজে ভক্তি রস আস্বাদন করলেন এবং আনুষঙ্গে জগৎ জীবের কল্যাণের জন্য তা প্রকাশ করে শিক্ষাও দিলেন।

(খ) মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের তুলসী সেবা ঃ—

স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যহ তুলসী সেবার আদর্শ স্থাপন করেছেন। মহাপ্রভু প্রত্যহ গঙ্গা স্নানান্তে গৃহে এসে চরণ প্রক্ষালন করে বিষ্ণু পূজন করতেন। অনন্তর তুলসী মহারাণীকে দর্শন, প্রণাম, অভিষেক, পূজন, পরিক্রমা, বন্দন, স্তবাদি

করার পরে তিনি ভোজনে গমন করতেন। ভোজনে গিয়ে তিনি তুলসী মঞ্জরী যুক্ত নৈবেদ্যাদি আনন্দে গ্রহণ করতেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাপ্রভুর তুলসী সেবার বর্ণনা দিয়েছেন।

যথাঃ— "বহুবিধ ক্রীড়া করি জাহ্নবীর জলে।
গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতূহলে।।
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসেন গিয়া বলি হরি হরি।।

চৈ,ভা, আদি - ৬/৭০-৭১

"গঙ্গা জলে বিহার করিয়া কতোক্ষণ।
গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজন।।
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনের বসেন গিয়া বলি হরি হরি।।

চৈ,ভা, আদি- ৮/১০০- ১০১

"তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন।
যথা বিধি করি প্রভু গোবিন্দ পূজন।।
আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন।
তুলসী মঞ্জরী সহিত দিব্য অন্ন।।
মায়ে আমি সন্মুখে করিলা উপসন্ন।

চৈ,ভা,মধ্য- ২/১৮৫- ১৮৬

"সর্বগণে গৌরচন্দ্র গঙ্গাস্নান করি।
কূলে উঠি উচ্চ করি বলে হরি হরি।।

গৃহে আসি প্রভু ধুইলেন চরণ।
তুলসীর করিলেন চরণ বন্দন।।
ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর।
নৈবেদ্যান্ন আনি মায়ে করিলা গোচর।।
চৈ,ভা, মধ্য- ২/৩৬৬-৩৬৭

"সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলা।
জাহ্নবীতে বহুবিধ জলক্রীড়া কৈলা।।
সভার সহিত আইলেন করি গঙ্গাস্নান।
তুলসীরে প্রদক্ষিণ করি জলদান।।
বিষ্ণু গৃহে প্রদক্ষিণ নমস্কার করি।
সবা লই ভোজনে বসিলা গৌর হরি।।
চৈ,ভা,অন্ত্য- ১/২৭৩- ২৭৫

এভাবে মহাপ্রভু শ্রীমতী তুলসী দেবীর সেবার আদর্শ প্রদর্শন করে জগৎ জীবের প্রতি শিক্ষা প্রদান করেছেন।

(গ) শ্রীমতী রাধারাণীর তুলসীসেবা ঃ—

শ্রীমন্মহর্ষি গর্গাচার্য্য প্রণীত "শ্রীশ্রীগর্গসংহিতায় বৃন্দাবন খন্ডে" ১৬ শ অধ্যায়ে শ্রীমতী রাধারাণীর তুলসী সেবার আখ্যান আলোচিত হয়েছে। এক সময় সর্ব ধর্মজ্ঞ সখী চন্দ্রাননার কাছে শ্রীমতী রাধারাণী প্রশ্ন করলেন- কি উপায়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করা যায়। এজন্য উত্তম সৌভাগ্য বর্দ্ধক কোন ব্রতের কথা জানতে চাই /শ্রীমতী রাধারাণীর বাক্য শ্রবণ করে সখী চন্দ্রাননা বললেন—

"শ্রীচন্দ্রাননোবাচ —
পরং সৌভাগ্যদংরাধে মহাপুণ্যং বরপ্রদম্।

শ্রীকৃষ্ণস্যাপি লব্ধ্যর্থং তুলসী সেবনং মতম্।।
দৃষ্টা স্পৃষ্টাথ বা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নামভিঃ স্তুতা।
রোপিতা সিঞ্চিতা নিত্যং পূজিতা প্রতি পালিতা।।
নবধা তুলসী ভক্তিং যে কুর্ব্বন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটি সহস্রাণি তে যান্তি সুকৃতং শুভে।।"

সখী চন্দ্রাননা বললেন- হে শ্রীমতী রাধে! শ্রীকৃষ্ণ লাভের জন্য আমার মতে পরম সৌভাগ্য ও বরপ্রদ মহাপুণ্য তুলসী সেবা করা কর্তব্য। তুলসীর স্তুতি, রোপণ, সেচন, পালন, দর্শন, স্পর্শ, ধ্যান, কীর্তন, নিত্যপূজা- এই নয় প্রকার তুলসী- সেবা যে সকল মানব প্রতিদিন করেন তারা হরি ধামে সহস্র কোটি যুগ পর্যন্ত সুখভোগ করেন। যাদের রোপিত তুলসী বৃক্ষের যত শাখা- প্রশাখা, বীজ- পুষ্প, পত্র বর্দ্ধিত হবে, ধরা তলে তাঁদের বংশে যাঁরা জন্মেছেন, যারা জন্মাবেন এবং যারা জন্মিয়া মৃত হয়েছেন, কল্পান্ত সহস্র যুগ তাদের হরিগৃহে বাস হয়।

হে শ্রীমতী রাধিকে! সর্ববিধ পত্র পুষ্পে যে ফল লাভ হয় একটি মাত্র তুলসী দলে সর্বদা সেই ফল লাভ হয়। যে মানব তুলসী পত্র দ্বারা শ্রীহরির পূজা করেন। তিনি পদ্ম পত্রের জলেন ন্যায় পাপলিপ্ত হন না। হে রাধে! যার গৃহে তুলসীবন বিদ্যমান তার গৃহ তীর্থ স্বরূপ, সেখানে যমদূতগণ প্রবেশ করে না। যারা তুলসীবন রোপন করেন, তাদের যম দর্শন হয় না। তুলসী রোপণ, পালন, সেচন, দর্শন, স্পর্শ মানব গণের বাক্য, মন- কায় কৃত সমস্ত কলুষ তুলসী দেবী নাশ করেন। পুষ্করাদিতীর্থ, গঙ্গাদি নদী, ভগবান বাসুদেব তুলসীদলে বাস করেন। তুলসী যুক্ত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলে শত পাপযুক্ত ব্যক্তিও যমলোক দর্শন করে না। তুলসী তলে পিতৃ শ্রাদ্ধ করলে শ্রাদ্ধ দত্ত দ্রব্য অক্ষয় হয়। হে সখি! বিষ্ণুর অনন্ত মহিমার মত তুলসীর মহিমাও অনন্ত। তুমি নিত্য তুলসী সেবা কর, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তোমার বশীভূত থাকবেন। শ্রীমতী রাধারাণী সখী চন্দ্রাননার কথা শুনে হরি সন্তোষ কারক তুলসী সেবন ব্রত আরম্ভ করলেন। কেতকী বন মধ্যে শত হস্ত সুবর্ত্তুল সুবর্ণ খচিত উচ্চ ভিত্তির উপর তুলসী মন্দির নির্মিত হলো। পদ্মরাগ মণি দ্বারা মন্দির সোপান, হরিৎ বর্ণ হীরক দ্বারা ও

মুক্তা দ্বারা প্রাচীর এবং মন্দিরের চতুর্দ্দিকে চিন্তামণি মণিমন্ডিত তোরণ প্রস্তুত হলো। উচ্চ তোরণের উপর সুবর্ণ ধ্বজ উত্তোলিত ও তা সুবর্ণ পতাকা যুক্ত হওয়ায় বৈজয়ন্তী মালার ন্যায় প্রতিভাত হতে লাগল।

শ্রীমতী রাধারাণী গর্গাচার্যকে আহ্বান করে তারই কথিত বিধানে অভিজিৎ নক্ষত্রে তুলসী মন্দির মধ্যে হরিৎ বর্ণ পল্লব শোভিত তুলসীবৃক্ষ স্থাপিত করে তুলসী মহারাণীর সেবা করতে লাগলেন। শ্রীমতী রাধারাণী পরমভক্তি ভরে শ্রীকৃষ্ণ তোষণের জন্য আশ্বিন পূর্নিমা হতে আরম্ভ করে চৈত্র পূর্নিমা পর্যন্ত এই ব্রত পালন করলেন। দুগ্ধ-ইক্ষু- দ্রাক্ষা- আম্ররস, শর্করা, মিশ্রি ও পঞ্চামৃত দ্বারা মাসে মাসে পৃথক পৃথক স্নান করালেন। বৈশাখ মাসে শুক্লা প্রতিপদে উদযাপনের উদ্যোগ করলেন। রাধারাণী ছাপ্পান্ন প্রকার ভোজ্য এবং বসন ভূষণ দ্বারা দ্বিলক্ষ ব্রাহ্মণের তৃপ্তি সাধন করে তাদের দক্ষিনা দান করলেন। লক্ষভার স্থূল মুক্তা ও কোটিভার স্বর্ণ গর্গাচার্য্যকে দান করলেন। শতভার স্বর্ণ ও মুক্তা ভক্তিভরে প্রত্যেক বিপ্রকে দান করলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বাদিত হলো, দেবগণ শ্রীমতী রাধারাণীর মন্দিরের উপর পুষ্প বৃষ্টি করলেন। তখনই শ্রীমতী তুলসী দেবীর আবির্ভাব হলো। তিনি গরুড় পৃষ্ঠে উত্তম আসনে সমাসীনা, পদ্ম নেত্রা, শ্যাম বর্ণা, উজ্জ্বল মুকুট ও কুন্ডলে শোভিতা, পীত বসন ও বৈজয়ন্তী মাল্য ধারিণী। তুলসীদেবী গরুড় হতে অবতরণ করে শ্রীমতী রাধারাণীকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্রীমতী তুলসীদেবী রাধারাণীকে বললেন — হে কলাবতী তনয়ে! তোমার ভক্তিতে আমি প্রসন্না হয়েছি এবং নিরন্তর তোমার বশীভূত আছি। তুমি লোক ব্যবহার সংগ্রহ করে সর্বসৌখ্য জনক এই ব্রত করেছ। তোমার মনোরথ সফল হোক। তুলসী মহারাণী যখন এরূপ বললেন তখন শ্রীমতী রাধারাণী প্রণাম পূর্বক তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন- "আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন গোবিন্দ চরণে অহৈতুকী ভক্তি হয়।" তুলসী মহারাণী বললেন তোমার এ প্রকার অভীষ্ট পূর্ণ হোক। এরূপ বর প্রদান করে তুলসী মহারাণী অন্তর্হিতা হলেন। আর শ্রীমতী রাধারাণীও প্রসন্ন হৃদয়ে স্বভবনে গমন করলেন। এ প্রকার আখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি কেহ যদি ঐকান্তিক ভাবে শ্রীমতী তুলসী মহারাণীর সেবা পূজাদি করেন তা হলে তুলসী মহারাণী তার সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করেন।

(ঘ) বারবনিতা লক্ষহীরার তুলসী সেবা ঃ—

তুলসী সেবায় তুলসীদেবী এবং ভগবান প্রসন্ন হন। তুলসীদেবী ভক্তি জননী, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা লীলাশক্তি, সর্বদুঃখ হারিণী, শ্রীকৃষ্ণ প্রেম প্রদায়িনী, শ্রীকৃষ্ণের সাথে মায়াবদ্ধ জীবের মিলন কারিণী। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনে এবং বারবনিতা লক্ষ হীরার সাধন ভজনেও তুলসী সেবার মহিমা পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতা মৃতে অন্ত্যলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদে দৃষ্ট হয়। —

"নির্জন বনে কুটির করি, তুলসী সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্তন।।"

চৈ,চ,অন্ত্য-৩/৯২

হরিদাস ঠাকুর নির্জন বনে কুটির করে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ এবং তুলসী মহারাণীর সেবা করতেন। কিন্তু বৈষ্ণব বিদ্বেষী রামচন্দ্র খান হরিদাসের বৈরাগ্য ব্রত নষ্ট করার জন্য বারবনিতা লক্ষ হীরাকে প্রেরণ করলেন। প্রথম রাত্রে লক্ষহীরা হরিদাসের ভজন কুটীরের কাছে গিয়ে—

"তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া।।"

চৈ,চ,অন্ত্য-৩/১০২

হরিদাসের ভজন কুটিরের সম্মুখে তুলসী মঞ্চ ছিল। লক্ষহীরা সেখানে গিয়ে প্রথমেই তুলসী মহারাণীকে দর্শন করলেন, তারপর প্রণাম করলেন। তুলসী দর্শনে মনের স্বস্তি ফিরে আসে। তুলসী মহারাণীকে দর্শন, প্রণামের কথা লক্ষহীরাকে কেহই উপদেশ দেয়নি তথাপিও সে সংস্কার বশতঃ তুলসীকে প্রণাম করল। তারপরে হরিদাসকে নমস্কার করল। এভাবে সে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করল।

পুনঃ দ্বিতীয় রাত্রে লক্ষহীরা আবার —

"তুলসীকে তাঁকে বেশ্যা নমস্কার করি।

দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি।।"

চৈ, চ,অন্ত্য-৩/১১৪

মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য দ্বিতীয় রাত্রে আবার লক্ষহীরা হরিদাসের কুটীর সম্মুখে গিয়ে প্রথমেই তুলসী দেবীকে নমস্কার করলেন তারপর দ্বারে বসে হরিদাসের উচ্চারিত নাম শ্রবণ কালে মাঝে মাঝে হরিধ্বনি করেন। তার অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় আবার তৃতীয় রাত্রে হরিদাসের কুটীর সম্মুখে এসে —

"তুলসীকে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি।।"

চৈ, চ,অন্ত্য-৩/১২০

তৃতীয় রাত্রে লক্ষহীরা এসে তুলসীকে দর্শন, প্রণাম করে হরিদাসকে প্রণাম করলেন। তৃতীয় দিনে তার মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হলো। হরিদাসের চরণে পরে নিজের অসৎ অভিলাষের জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং উদ্ধারের জন্য হরিদাসের কৃপা প্রার্থনা করলেন।

তিন দিন যাবৎ তুলসী দেবীর দর্শন, প্রণাম এবং তুলসীর সমীপে দীর্ঘ সময় অবস্থান, আর হরিদাসের মুখে থেকে নাম শ্রবণে লক্ষ হীরার আমূল পরিবর্তন হলো। তুলসী মহারাণীর সেবার ফলে তার চিত্ত ও মনের একাগ্রতা আনয়ন করেছে। তুলসীর নিকট অবস্থান করলে স্বভাবতই মানসিক একাগ্রতা জন্মে। কেননা তুলসী বৃক্ষ শুদ্ধ সাত্ত্বিক গুণ তথা আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক। তুলসীর আবহাওয়া ভজনে স্ফূর্তিময় করে। এভাবে দেখা যায় হরিদাসের কৃপায় এবং তুলসী দেবীর নিকটে অবস্থানের ফলে, তুলসীকে দর্শন করে, তুলসীকে নমস্কার করে তথা ভক্ত্যাঙ্গের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার লক্ষহীরার পরিবর্তন হয়ে তার চেতনা বিকশিত হলো। তাই হরিদাসের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিস্তারের জন্য প্রার্থনা জানাল। হরিদাস ঠাকুর তাকে বললেন তোমার ধন সম্পদ সব ব্রাহ্মণকে দান কর আর —

"নিরন্তর নাম লও কর তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।।"

চৈ, চ, অন্ত্য-৩/১২৯

হরিদাস ঠাকুর তাকে উপদেশ দিলেন তুমি এই ভজন কুটিরে বাস করে তুলসী মহারাণীর সেবা কর আর কৃষ্ণ নাম কর, তাহলে অচিরাৎ কৃষ্ণ চরণ পাবে। লক্ষ হীরা সর্বস্ব ব্রাহ্মণকে দিয়ে —

"তুলসী সেবন করে চর্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ।।"

চৈ,চ, অন্ত্য-৩/১৩৩

তুলসী দেবীর সেবার ফলে, চর্বনের ফলে, এবং উপবাসের ফলে লক্ষ হীরার দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা দূরীভূত হলো এবং ক্রমশঃ প্রেমের প্রকাশ হতে লাগল। এভাবে দেখা যায় তুলসী দেবীর সেবার ফলে প্রবল ইন্দ্রিয় চপলতা দূর হয়ে পরমানন্দ লাভ করা যায়।

(ঙ) মায়াদেবীর তুলসী সেবা ঃ—

নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়ায় গঙ্গাতীরে যখন ভজন করতেন তখন একদিন জোৎস্নাময়ী রাতে মায়াদেবী এক সুন্দরী রমনী বেশে হরিদাস ঠাকুরের গোঁফায় আসে হরিদাস ঠাকুরকে পরীক্ষা করার জন্য। চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলায় বলা হয়েছে —

"দুয়ারে তুলসী লেপা পিণ্ডির উপর।
গোঁফার শোভা দেখি জুড়ায় অন্তর।।
হেন কালে নারী এক অঙ্গনে আইলা।
তার অঙ্গ কান্তে স্থান পীতবর্ণ হৈলা।।
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈলা নমস্কর।

তুলসী- পরিক্রমা করি গেলা গোঁফাদ্বার।।

হরিদাস ঠাকুর তার ভজন কুটিরের সামনে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। মায়াদেবী হরিদাসকে পরীক্ষার জন্য এসে প্রথমে তুলসী দেবীকে দর্শন করলেন, পরে নমস্কার করলেন, শেষে তুলসী পরিক্রমা করলেন এবং হরিদাসের প্রতি বিভিন্ন হাব- ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। এ ভাবে তিন দিন পরীক্ষার পর মায়াদেবী নিজ পরিচয় দিলেন। তিন দিন হরিদাসের পতনের চেষ্টা করে তিনি অকৃতকার্য হয়ে চলে যান।

(চ) ব্যাধ কর্তৃক তুলসী সেবা ঃ—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় ২৪ শ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, দেবর্ষি নারদ এক ব্যাধকে সর্বস্বত্যাগ করতে বলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভজনের উপদেশ প্রদান করেন—

"নদীতীরে একখানি কুটির করিয়া।
তার আগে একপিণ্ডি তুলসী রোপিয়া।।
তুলসী পরিক্রমা কর তুলসী সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন।।
চৈ,চ,মধ্য- ২৪/১৮২- ১৮৩

শ্রীল নারদমুনি ব্যাধকে নদীর তীরে একখানি কুটির নির্মাণ করে তার সম্মুখে প্রথমেই একটি তুলসী মঞ্চ নির্মাণ করে তুলসী রোপণের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিদিন তুলসী পরিক্রমা করতে এবং বিভিন্ন প্রকার তুলসী সেবা করতে উপদেশ দেন। অনন্তর তুলসীর সম্মুখে নিরন্তর কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যাধ নারদ মুনির উপদেশ পালন করে অর্থাৎ তুলসী প্রণাম করে, পরিক্রমা করে, দর্শন করে ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান করেছিলেন। ফলে পরবর্তী কালে ব্যাধ এক শুদ্ধ ভগবৎ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। এভাবে দেখা যায় যে, সাধক জীবনে তথা শ্রীভক্তি অনুশীলনে তুলসীদেবীর বিভিন্ন সেবার গুরুত্ব অপরিসীম।

ছ) শিব- পার্বতীর তুলসী দ্বারা বিষ্ণুপূজা ঃ—

রমনীয় কৈলাস পর্বতের শোভা অতীব মনোরম, মৃদুমন্দ সমীরণ সেখানে অনুক্ষণ প্রবাহিত হয়। নানা প্রকার পুষ্পের সুগন্ধে আকাশ বাতাস সুগন্ধিত। ভুবন পাবন মুনি ঋষিগণ তথায় আত্ম কল্যাণ তথা জগতের কল্যাণের জন্য চিন্তায় মগ্ন। শিব- পার্বতী সেখানে সুখাসনে উপবিষ্ট থাকেন। শিব অনুচর গণ তথায় প্রফুল্ল অন্তরে বিরাজ করেন। একদিন গিরিবালা পার্বতী দেবী মহেশ্বর শিবকে সম্বোধন করে বললেন- হে প্রাণনাথ! আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি এই যে, নিত্য শ্রীহরির পূজার জন্য আমার সখীগণ পুষ্প চয়ন করেন, কিন্তু তুলসী পত্র আপনি স্বহস্তে চয়ন করেন ও অতি যত্ন সহকারে শ্রীহরির পূজা করেন। কৃপা করে আপনার স্বহস্তে তুলসী চয়নের কারণ বলুন।

পার্বতীর বাক্য শ্রবণ করে শিব হাস্য পূর্বক বললেন- হে সীমন্তিনী! আমি যা বলছি মন দিয়ে শ্রবণ কর। তুলসী মহারাণীর মহিমা আমি যদি পঞ্চমুখে সর্বদা কীর্তন করি তা হলেও তাঁর মহিমার অন্ত্য পাই না। তবুও তোমার প্রশ্নের উত্তরে কিছু বর্ণনা করছি মন দিয়ে শ্রবণ কর।—

তুলসী বন যথায় বিদ্যমান রয়।
রোগ শোক তাপত্রয় তথা নাহি হয়।।
তুলসী সুগন্ধ যদি প্রবেশে নাসায়।
অমঙ্গল গ্রহগণ পালাইয়া যায়।।
যতদূর গন্ধ যায় শুন তার গুণ।
সর্বত্র পবিত্র হয় জানে সুধী জন।।
তুলসী চরণে প্রাণ রাখে যেই জন।
বিষ্ণু দূত নিতে তারে করে আগমন।।
বৈকুণ্ঠেতে নিত্যবাস করে সে সুজন।
একথা শাস্ত্রেতে শুনি জানে ত্রিভুবন।।
কৃষ্ণ চরণে তুলসী অর্পেন যে জন।

সে হেন জনেতে কৃষ্ণ অনুরক্ত হন ।।
এই লাগি নিত্য ভক্তি তুলসীরে করি।
কহিলাম গুণ কিছু শুনিলে সুন্দরী ।।

এভাবে পার্বতী দেবী শিবের নিকট হতে তুলসী দেবীর মহিমা শ্রবণ করে ভক্তি ভরে তুলসীর চরণে প্রণাম করলেন। পার্বতীদেবী প্রতিদিন সপ্ত সমুদ্রের জল আনয়ন করে শ্রীমতী তুলসী দেবীকে ভক্তিভরে স্নান করান। যোগাসনে বসে প্রত্যহ শাস্ত্রীয় বিধানে তুলসীর মূলে শ্রীহরির পূজা করেন। তুলসীপত্র স্বযত্নে স্বহস্তে চয়ন করে দ্বাদশটি তুলসীপত্রকে সুগন্ধি যুক্ত শ্বেতচন্দনে লেপন করে শ্রীহরিকে অর্পন করেন এবং ধ্যান যোগে শ্রীহরিকে ভাবনা করেন। এভাবে পার্বতীদেবী নিত্য তুলসী দ্বারা শ্রীহরির পূজা করার ফলে শ্রীহরি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। এক সময় পার্বতীদেবী গভীর ধ্যানে নিমগ্না ছিলেন। এরূপ সময় শ্রীহরি পার্বতীর সন্মুখে আবির্ভূত হলে পার্বতীর ধ্যান ভঙ্গ হয়। তখন পার্বতীদেবী শ্রীহরিকে দর্শন করলেন। শ্রীহরি পার্বতী দেবীকে বললেন যে, তোমার সেবায় আমি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে শ্রীমতী তুলসী দেবীর অষ্টোত্তর শতনাম প্রদান করছি। শ্রীহরি পার্বতীকে তুলসীদেবীর অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র প্রদান করে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হন।

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য।

।। পঞ্চম মঞ্জরী ।।

ক) তুলসীবন পূজা মাহাত্ম্য ঃ—

শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসের নবম বিলাসে তুলসীবন পূজা মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। হরিভক্তিবিলাস ধৃত অগস্ত্য সংহিতায় বলা হয়েছে- তুলসী রোপণ, সেবন, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা পবিত্রতা লাভ হয় এবং সযত্নে উপাসনা করলে যাবতীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। প্রতিদিন তুলসী প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলে সকল পাপ ধ্বংস হয়। যে গৃহে প্রত্যহ তুলসী অর্চনা হয় তথায় যাবতীয় মঙ্গল পরিবর্ধিত হয়। কলিকালে শ্রীহরি তীর্থক্ষেত্র ও নিখিল ভূধর ত্যাগ করে একমাত্র তুলসী কাননেই নিত্য অধিষ্ঠান করেন। যিনি যথা বিধি তুলসীবন রোপণ করেন তিনি পরম পদ লাভ করেন। বিশেষতঃ শ্রবণা নক্ষত্র যোগে তুলসী রোপণ করা কর্তব্য, শ্রবণায় তুলসী রোপণ করলে রোপণ কর্তার সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন। যে সমস্ত দেব মন্দির বা পুণ্য ভূমিতে তুলসী বৃক্ষ রোপিত হয় সে সমস্ত স্থান শ্রীহরির তীর্থ স্বরূপ। চৈত্র সংক্রান্তি হতে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত তুলসীতে জলধারা দান ও ছায়া দান করলে পরম গতিলাভ হয়।

একাদশী মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে, যিনি যথা বিধি তুলসীবন রোপণ করেন, তার বংশে যারা মৃত হয়েছেন, যারা বর্তমান আছেন এবং যারা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবেন তারা সকলেই কল্পান্ত কাল পর্যন্ত শ্রীহরি গৃহে বাস করেন। যে স্থলে বায়ু তুলসী গন্ধ বহন পূর্বক প্রবাহিত হয় তার চতুর্দিগস্ত সমস্ত জীবই শুদ্ধি লাভ করে। যে তুলসী বনে তুলসী বীজ পতিত হয় সেখানে পিতৃ গণের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিলে সে পিণ্ড অক্ষয় হয়ে থাকে। প্রত্যহ তুলসী দর্শন, স্পর্শ, চিন্তন, কীর্তন, প্রণাম, গুণ শ্রবণ রোপণ, অর্চন ও সেবা করলে সকল পাপ ভস্মীভূত হয়, এবং অন্তে শ্রীহরির ধামে বসতি লাভ হয়। বৈশাখ মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে পুষ্করাদি তীর্থ, গঙ্গাদি নদী এবং ভগবান বিষ্ণু তুলসীদলে অধিষ্ঠিত থাকেন। যে গৃহে তুলসী সলিল দ্বারা সকলে অভিষিক্ত হয় যমদূতেরা সেই গৃহ সমীপ যেতে পারে না। হরিতকী ফল যেরূপ রোগশান্তি করে

সেরূপ তুলসী বহুল দারিদ্র দুঃখ হারিণী। তুলসী সন্নিধানে দেহ বিসর্জন করলে তার হরি ধামে গতি হয়। প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে অপর দ্রব্য দর্শন না করে, প্রথমেই তুলসী দর্শন করলে তৎক্ষণাৎ তার দিবারাত্র কৃতপাপ বিনষ্ট হয়। যিনি তুলসী বৃক্ষ রোপণ করেন তার পিতৃ মাতৃকুলের সপ্তকোটি পুরুষ হরিসন্নিধানে অবস্থান করেন।

তুলসীবৃক্ষে গণ্ডুষ পরিমানে জল প্রতিদিন সেচন করলে হরিসন্নিধানে বসতি লাভ হয়। কাষ্ঠ দ্বারা তুলসীর বনের চারিদিকে আবরণ দিলে আবরণ দাতা ত্রিকুল সহ ভগবৎ ধামে অবস্থান করেন। প্রলয় কালীন অগ্নি যেমন নিখিল দ্রব্য ভস্মীভূত করে তদ্রূপ তুলসী মহিমা শ্রবণ, দর্শন, রোপণ, জল সেচন, প্রণাম দ্বারা অখিল পাপ দগ্ধ হয়। বুধবার ও শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত শুক্লা তৃতীয়াতে তুলসী রোপণ করলে তুলসীদেবী অতি পুণ্যদায়িনী হন।

খ) তুলসী দ্বারা অর্চন মাহাত্ম্য ঃ—

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সপ্তম বিলাসে তুলসী দ্বারা অর্চনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হরিভক্তিবিলাস ধৃত বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলা হয়েছে- তুলসী বিহীন অর্চনা অর্চন নয়, তুলসী রহিত স্নান স্নান বলে গণ্য নয়, তুলসী হীন ভোজন ভোজন নয়, তুলসী রহিত পান পান বলে গণনীয় নয়। বায়ু পুরাণে লিখিত আছে জনার্দ্দন কদাচ তুলসী ব্যতীত অর্চন গ্রহণ করেন না। তুলসী পত্রের অভাব হলে তুলসী কাষ্ঠ ভগবানের অঙ্গে স্পর্শ করান উচিৎ। যদি তারও অভাব হয় তবে তুলসী নাম উচ্চারণ করে জনর্দ্দেনের অর্চনা করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি তুলসী পত্র দ্বারা বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা করে সে ব্যক্তি গোঘাতী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নী গামীর তুল্য পাপী হয়।

বিষ্ণু রহস্যে লিখিত আছে- মনোরম মঞ্জরী বিশিষ্ট, অখণ্ড হরিৎ বর্ণ তুলসী পত্র জনার্দ্দনকে অর্পণ করা কর্তব্য। কি কৃষ্ণ বর্ণ কি হরিৎ বর্ণ সমস্ত তুলসীই গোবিন্দের

প্রিয়া। যেমন কি কৃষ্ণপক্ষীয়া কি শুক্লপক্ষীয়া উভয় পক্ষীয়া দ্বাদশী তিথি গোবিন্দের প্রিয়া, পরম বল্লভা। পদ্ম পুরাণে উত্তর খণ্ডে বৃন্দা উপাখ্যানে বলা হয়েছে- বৃন্দার প্রীতিজনক বচনই সত্ত্ব ও তদীয়া রোষই ত । এই গুণদ্বয়ের সংস্পর্শে শ্রীহরিতে দুটি ভাব সঞ্জাত হয়, সে জন্য তুলসী দুই বর্ণ বিশিষ্ট হয়েছে। তারমধ্যে কৃষ্ণ বর্ণা তুলসী শ্রীহরির প্রিয়া হলেও হরিৎবর্ণা তুলসী সমধিক প্রিয়তমা।

সকল পুষ্পাপেক্ষা তুলসীতে শ্রীহরির অধিক প্রীতি আছে। মালতী, পদ্ম প্রভৃতি বিসর্জন করেও পর্য্যুসিত ও শুষ্ক তুলসীপত্র শ্রীহরি গ্রহণ করে থাকেন। কামিকা একাদশী ব্রত মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে—

"তুলসী মঞ্জরাভিস্তু পূজিতো যেন কেশবঃ।
আজন্ম কৃত পাপস্য তেন সমার্জিতা লিপিঃ।।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তুলসী মঞ্জরী দ্বারা কেশবের পূজা করেন, তিনি জন্মাবধি অনুষ্ঠিত পাপ রাশির লিপিকে মার্জনা করতে পারেন।

অগস্ত্য সংহিতায় বলা হয়েছে যে,- মন্ত্র পাঠ সহকারে একটি মাত্র তুলসী পত্র শ্রীহরির শিরোদেশে প্রদত্ত হলে ঐ পত্র অনন্ত ফল প্রদান করেন। অন্যত্র লিখিত আছে- শ্রীহরির শিরোদেশে তুলসী অর্পিত হলে ঐ তুলসী মানবের অকথ্য গোপনীয় পাপ রাশি ধ্বংস করে। যে ব্যক্তি তুলসীপত্র বিনিসৃতঃ জলবিন্দু দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা শ্রীহরির গৃহ মার্জন করেন, তিনি মহাপাপ থেকে পরিত্রান পান। স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে যে, তুলসীর দল ও মঞ্জরী শ্রীহরির শিরোদেশে প্রদত্ত হলে উহা কোটি কাঞ্চন দান অপেক্ষাও অধিক ফল প্রদান করেন। পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তুলসী মঞ্জরী দ্বারা জনার্দ্দনের পূজা করেন তাকে আর গর্ভে প্রবিষ্ট হতে হয় না।

হরিভক্তি সুধোদয়ে দ্বিজের প্রতি যমদূতের উক্তি-"ধার্মিক বা অধার্মিক যিনি হোন না কেন তুলসী দ্বারা কেশবের পূজা করলে তার মরণান্তে আমরা তাকে স্পর্শ করতে সমর্থ হই না, তিনি বিষ্ণু দূত কর্তৃক নীত হন। তুলসী পত্রের গন্ধ বিশিষ্ট যে কোন দ্রব্য কেশবকে অর্পণ করলে তাতে তিনি সহস্র কোটি কল্প কাল প্রীত থাকেন।

গ) শ্রীভগবানের চরণে তুলসী অর্পণের বিধি ঃ—

বিধি পূর্বক তুলসী পত্র চয়ন পূর্বক ধৌত করা কর্তব্য। তারপর জলশূণ্য করে চন্দন মিশ্রিত করুন। অনন্তর অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বৃন্তটি ধারণ পূর্বক পত্র পৃষ্ঠ নীচে রেখে অর্থাৎ যে ভাবে উৎপন্ন হয়েছে ঠিক সে ভাবে তুলসী পত্র ভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করা কর্তব্য। অর্পণ কালে তুলসী পত্রের পৃষ্ঠদেশ দর্শন করা উচিৎ নয়। হরিৎ বর্ণা তুলসী পত্র শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রীতিদায়ক। একমাত্র শ্রীভগবানের চরণেই তুলসী অর্পণ করা যায়। কোন দেবদেবী বা গুরুদেবের চরণে কেহ তুলসী অর্পণ করলে অনন্ত কাল নরকে বাস হবে।

ঘ) তুলসী জলে স্নান মাহাত্ম্য ঃ—

তুলসী জলে স্নান মাহাত্ম্য সম্পর্কে হরিভক্তিবিলাসে গরুড় পুরাণ বাক্য (৪ র্থ বিলাস)। প্রত্যহ তুলসী মূলস্থ মৃত্তিকা দেহে লেপন করলে দশ সংখ্যক অবভৃথ স্নান ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি শিরোদেশে তুলসীযুক্ত জল ধারণ করেন, গঙ্গা ধারণ করলে যে ফল লাভ হয় তিনি সেইফল প্রাপ্ত হন। তুলসী সংযুক্ত জল শিরোদেশে ধারণ করলে সমস্ত তীর্থ স্নানের ফল লাভ হয়।

ঙ) তুলসী কাষ্ঠ চন্দন মাহাত্ম্য ঃ—

তুলসী কাঠের চন্দন মাহাত্ম্য সম্পর্কে হ.ভ. বি. ধৃত গরুড় পুরাণে বলা হয়েছে যে,- শ্রীহরিকে তুলসী কাঠের চন্দন প্রদান করলে পূর্ব শত জন্মের পাপ নিঃসন্দেহে দগ্ধীভূত হয়। দেহ ত্যাগকালে যার শরীরে তুলসী চন্দন লিপ্ত থাকে, সে ব্যক্তি হরি সারূপ্য প্রাপ্ত্য হয়ে শ্রীহরিকে লাভ করেন। কলিযুগে শ্রীহরিকে তুলসী কাঠের চন্দন প্রদান করলে তাকে আর এই জগতে উপস্থিত থাকতে হয় না।

চ) তুলসী কাষ্ঠ মাহাত্ম্য, (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত) ঃ—

তুলসী কাষ্ঠাগ্নিতে অন্ন পাক করতঃ শ্রীহরিকে নিবেদন করলে সেই অন্ন সুমেরু সদৃশ্য এবং অত্যন্ত স্বাদু হয়। যে সকল মৃত ব্যক্তির কলেবর তুলসী কাষ্ঠাগ্নিতে দাহ করা হয় তাদের কোন কালেও হরিধাম হতে সংসার জগতে আসতে হয় না। মৃতদেহ তুলসীকাষ্ঠে দাহ করলে অগম্যাগমনজনিত দোষও নষ্ট হয়ে যায়। মৃতদেহ দাহ সময়ে অন্যান্য কাষ্ঠের সহিত মাত্র একখণ্ডে তুলসী কাষ্ঠ থাকলেও কোটি পাপ হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। একাদি ক্রমে সহস্র কোটি জন্ম যাবৎ শ্রীহরির প্রীতি সাধন করলে তবে ভাগ্যে তুলসী কাষ্ঠাগ্নিতে দেহ দাহ ঘটে থাকে। যে গৃহে তুলসী মৃত্তিকা, তুলসী কাষ্ঠ, তুলসী পত্র বিরাজিত থাকে সেই গৃহ শ্রীহরির বাস ভূমি। তুলসী বৃক্ষের মূলস্থ মৃত্তিকা ধারণ করলে নিখিল বিঘ্ন দূর হয়। অগস্ত্য সংহিতায় বলা হয়েছে- তুলসী কাষ্ঠের দ্বারা কণ্ঠী মালা ও জপ মালা প্রস্তুত করে পূজাদি করলে তা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

ছ) তুলসী পত্র ধারণ মাহাত্ম্য, (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত) ঃ—

শিরোদেশে তুলসী পত্র ধারণ করলে বৈষ্ণবজন ত্রিভুবন পবিত্র করতে সমর্থ হয়। কর্ণ মূলে তুলসীদল ধারণ করলে কোন প্রকার উপপাপ বিদ্যমান থাকে না। শিরে তুলসী পত্র ধারণ পূর্বক ধর্মাদির অনুষ্ঠান করলে সেই বৈষ্ণবের নিখিল কর্মই অক্ষয় ফলপ্রদ হয়ে থাকে। যিনি তুলসী হস্তে গমন করেন শ্রীহরি তদীয় রক্ষার্থে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করেন। তুলসীপত্র ধারণে সর্ব পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণু লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জ) তুলসী দল ভক্ষণ মাহাত্ম্য, (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত) ঃ—

শ্রীহরিকে তুলসী পত্র অর্পণ করে বৈষ্ণবেরা তুলসী পত্র গ্রহণ করেন। শত শত চান্দ্রায়ণ না করে ত্রিসন্ধ্যা ভগবৎ অর্পিত তুলসীদল ভক্ষণে তদপেক্ষা অধিক দেহ শোধন হয়। তুলসীদল ভক্ষণ করলে মহাপাতকীরও শুভ গতি লাভ হয়। তুলসী

ভক্ষণ পূর্বক অন্তঃকালে দেহ ত্যাগ করলে চণ্ডালেরও মহা মহা পাপও ভস্মীভূত হয়। দ্বাদশীতে উপবাসী থেকে পারণ দিনে অমৃত হতে উদ্ভূতা তুলসী পত্র ভক্ষণ করলে অষ্ট সংখ্যক অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের ফল লাভ হয়।

ঝ) অবশ্যই পালনীয় ঃ—

১। তুলসী মালা শ্রীহরিকে অর্পণ না করে ব্যবহার করবেন না।
২। তুলসী পত্র স্পর্শ করে কখনো মিথ্যা কথা বলবেন না।
৩। তুলসী বৃক্ষের ছায়া লঙ্ঘন করবেন না।
৪। পাদুকা পায়ে তুলসী স্পর্শ করবেন না।
৫। পশ্চিম মুখী হয়ে তুলসী চয়ণাদি করবেন না।
৬। স্নান না করে তুলসী- চয়ন করবেন না।
৭। শ্রীহরিকে নিবেদন না করে তুলসীদল গ্রহণ করবেন না।
৮। তুলসী একটি বৃক্ষ- এরূপ মনে করে অবজ্ঞা করবেন না।

উপরোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করলে মহা অপরাধী ও নিরয় গামী হবেন।
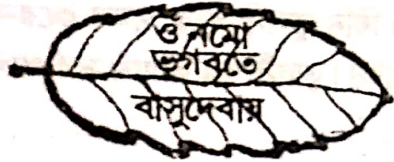
শ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

।। ষষ্ঠ মঞ্জরী ।।

ক) তুলসী কাষ্ঠ নির্মিত জপ মালার স্বরূপ ঃ—

শ্রীগৌর-গোবিন্দ ভজন পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণভক্ত গণের তুলসী কাষ্ঠ নির্মিত মালা কণ্ঠে ধারণ করা এবং তুলসী কাষ্ঠ নির্মিত জপ মালায় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র —

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

জপ করা অবশ্যই কর্তব্য। এই সংখ্যা নাম তথা হরিনাম মহামন্ত্র মালিকা দ্বারা জপের বিধান শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ক্রম দীপিকা, গৌতমীয় তন্ত্রাদিতে বর্নিত আছে।

তুলসী কাষ্ঠ নির্মিত জপের মালিকায় একশত আটটি (১০৮) গুটিকা থাকবে। একটি বিশেষ গুটিকা দ্বারা সুমেরু নির্দিষ্ট থাকবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে —

"সুমেরুং যুগলং রূপং পার্শ্বেহ্যষ্ট সখী তথা।
চতুঃ ষষ্টি গোপিকাশ্চ দ্বাত্রিংশদ্ গোপবালকাঃ।।
বীরা বৃন্দা পৌর্নমাসী গোপীশ্বর সমন্বিতম্।
এবং ক্রমেণ মালা স্যাৎ শতমষ্টোত্তরং ক্রমাৎ।।"

অর্থাৎ সুমেরুটি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল স্বরূপ। মালা জপের সময় সুমেরু লঙ্ঘন করতে নেই। অপর স্থূল ভাগ হতে আরম্ভ করে ললিতাদি অষ্ট সখীবৃন্দ, প্রতি অষ্ট সখীর অষ্টজন করে চৌষট্টি সখীবৃন্দ। তারপর বত্রিশজন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গোপসখাগণ এবং বীরাদূতী, বৃন্দাদূতী পৌর্নমাসী ও গোপীশ্বর মহাদেব এই প্রকার ক্রমশ ১০৮ টি গুটিকা জানতে হবে। সুমেরু মধ্যে সূত্ররূপে শ্রীমতী রাধারাণী তপ্তকাঞ্চন বর্ণা নীলবসনা বামামধ্যা এবং গ্রন্থি রূপে শ্রীকৃষ্ণ নবীন নীরদবর্ণ পীতাম্বরধারী ধীর ললিত রূপে রিরাজিত আছেন। এই ভাবে শ্রীতুলসী মালায় ১০৮ জন অবস্থান করেন। বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষণের জন্য তুলসী মালার থলে বা ঝোলা ব্যবহার করা অবশ্যই

কর্তব্য। সদ্ গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ পূর্বক গুরুদেব প্রদত্ত তুলসী মালিকায় মহামন্ত্র সংখ্যা নির্বন্ধ পূর্বক জপ করা বাঞ্ছনীয়।

খ) তুলসী কাষ্ঠ নির্মিত কণ্ঠীমালা ধারণ বিধি ঃ—

তুলসী কাষ্ঠের কণ্ঠীমালা কণ্ঠে ধারণে ভগবদালয়ে বাস হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মহিমার কথা বলা হয়েছে। স্মৃতি গ্রন্থরাজ শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস ধৃত "স্কন্দ পুরাণ" বাক্য। যথা ঃ—

"সন্নিবেদ্যৈব হরয়ে তুলসী কাষ্ঠ সম্ভবাৎ।
মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধত্তে স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।।

অনুবাদঃ— যিনি তুলসী কাষ্ঠের বিরচিত মালা শ্রীহরিকে অর্পণ পূর্বক পরে নিজে ধারণ করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ভগবৎ ভক্ত।

শ্রীহরিকে তুলসী মালা নিবেদন না করে ধারণ করা উচিৎ নয়।

"হরয়ে নার্পয়েদ যস্তু তুলসী কাষ্ঠ সম্ভবাৎ।
মালাং ধত্তে স্বয়ং মূঢ় স যাতি নরকং ধ্রুবম্।।"

অনুবাদঃ— যে মূর্খ তুলসী কাষ্ঠময়ীমালা শ্রীহরিকে অর্পণ না করে ধারণ করে সে নিঃসন্দেহে নরকে পতিত হয়।

তুলসীমালা ধারণের পূর্বে মালা অবশ্যই সংস্কার করা কর্তব্য।

" ক্ষালিতাং পঞ্চগব্যেন মূল মন্ত্রেণ মন্ত্রিতাম্।
গায়ত্র্যা চাষ্ট কৃত্বো বৈ মন্ত্রিতাং ধূপয়েচ্চ তাম্।
বিধিবৎ পরয়া ভক্ত্যা সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ।।"

অনুবাদঃ— মালা গ্রথিত করে পঞ্চগব্য দ্বারা ধৌত করে তদুপরি মূলমন্ত্র জপ করে অষ্টধা গায়ত্রী জপ কর্তব্য, পরে ধূম স্পর্শ করে... পূর্বক অর্চনা করা কর্তব্য।

তুলসী মালা ধারণ সময়ে প্রার্থনা করা কর্তব্য। যথা ঃ—

"তুলসী কাষ্ঠ সম্ভুতে মালে! কৃষ্ণজনপ্রিয়া।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরুমাং কৃষ্ণবল্লভম্।।
যথা ত্বং বল্লভা বিষ্ণোর্নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়া।
তথা মাং কুরু দেবেশি! নিত্যাং বিষ্ণুজনপ্রিয়ম্।।
দানে লা- ধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভে।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যসে।।"

অনুবাদঃ— হে মালে! তুলসী কাষ্ঠ দ্বারা তোমাকে নির্মাণ করা হয়েছে। কৃষ্ণভক্তেরা তোমাকেপ্রীতি প্রদর্শন করেন। আমি তোমাকে ধারণ করব। আমাকে শ্রীহরির প্রিয় পাত্র কর। হে কৃষ্ণ বল্লভে! যে রূপ তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া এবং কৃষ্ণভক্তেরা তোমাকে যেরূপ নিরন্তর প্রীতি প্রদর্শন করেন আমাকে সেইরূপ কৃষ্ণ ভক্তগণের প্রিয়পাত্র কর। "লা" ধাতুর প্রয়োগ দানার্থে হয়। হে কৃষ্ণ বল্লভে! নিখিল ভক্তকে তুমি আমায় দান করলে, অতএব তোমাকে মালা শব্দে কীর্তন করা যায়।

শ্রীতুলসী কাষ্ঠ নির্মিত মালা ধারণ করলে ভগবানের নিত্য ধামে বসতি হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে —

"এবং সংপ্রার্থ্য বিধিবৎ মালাং কৃষ্ণগলেঽর্পিতাম্।
ধারয়ে দ্বৈষ্ণবো যো বৈ স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদম্।।

অনুবাদঃ— যে বৈষ্ণব যথা বিধি প্রার্থনা করে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের গলায় মালা প্রদান করে তৎপরে স্বয়ং ধারণ করেন তিনি ভগবৎ ধামে গমন করেন।

তুলসীমালা ধারণ না করলে অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হবেন। হরিভক্তি বিলাসে ধৃত গড়ুর পুরাণ বাক্য। যথা—

"ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধা কোপাগ্নিনা হরেঃ।।"

অনুবাদঃ— যে সকল হেতুবাদ পরায়ণ পাপমতি মানব মালা ধারণ না করে তারা হরি কোপানলে দগ্ধীভূত হয় এবং নরক থেকে তারা মুক্তি লাভ করে না।

তুলসীমালা ধারণ মাহাত্ম্য সম্পর্কে হরিভক্তি বিলাস ধৃত অগস্ত্য সংহিতায় বলা হয়েছে —

"নির্মাল্য তুলসী মালা যুক্তো যশ্চার্চ্চয়েদ্ধরিম্।
যৎ যৎ করোতি তৎসর্বমনন্ত ফলদং ভবেৎ।।"

অনুবাদঃ— যিনি ভগবৎ অর্পিত তুলসী মালা ধারণ পূর্বক ভগবানের পূজা এবং অন্য যে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন তৎসমস্তই অক্ষয় ফলপ্রদ হয়।

নিবেদিত মাল্যধারণে কোন পাতক থাকে না। হ.ভ.বি.ধৃত. বিষ্ণুধর্মোত্তর বাক্য —

"সদা প্রীতমনাস্তস্য যো মালাং বহতে নরঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি না শৌচং তস্য বিগ্রহে।।"

অনুবাদঃ— যিনি ভগবৎ অপিত মালা ধারণ করেন, দেবকী নন্দনকৃষ্ণ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাকে প্রায়শ্চিও করতে হয় না এবং তার কোন পাতক থাকে না।

গ) শ্রীজীবের ভক্তিসন্দর্ভে তুলসী মহিমা ঃ—

শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ "ভক্তি সন্দর্ভে" অভিধেয় তত্ত্বের আলোচনায় ভক্তি তত্ত্বকে অতি সমুজ্জ্বল ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অল্পায়াস সাধ্য ভক্তিতে ভগবান যে ভক্তের প্রতি গভীর ভাবে বশীভূত তা "বিষ্ণু ধর্মোত্তর"- শাস্ত্রের একটি শ্লোকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। ভক্তি সন্দর্ভে ১৫৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে —

"তুলসীদল মাত্রেন জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রিনীতে স্বমাত্মনং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।।"

অনুবাদঃ— অল্পায়াস সাধ্য তুলসীদল সংযুক্ত এক গণ্ডুষ জল প্রদান মাত্রে ভক্ত বৎসল ভগবান ভক্তের এমনই বশীভূত হন যে, সেই ভক্তগণকে অন্য কিছু প্রতিদানের উপযুক্ত বস্তু না দেখে নিজেই আত্ম বিক্রয় করে থাকেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ "ভক্তিসন্দর্ভে" ২৮৩ অনুচ্ছেদে বলেছেন যে, সাধুসেবা, পাদসেবন ভক্ত্যাঙ্গের মধ্যে "তুলসী পরিচর্যা" পরিগণিত হয়, কেননা তুলসী দেবী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়া। পুরাণে বলা হয়েছে যে, শ্রীহরি সর্বদা বিশেষতঃ কলিকালে তুলসী কানন ব্যতীত অন্যত্র অনুরক্ত হন না। যারা তুলসী দর্শন করেন, তুলসী বন রোপণ করেন, তারা পরম পদ প্রাপ্ত হন। স্কন্দ পুরাণে তুলসী দেবীর স্তবে বলা হয়েছে যে, অসুর দর্পহারী শ্রীহরি তুলসী নাম শ্রবণ মাত্রেই পরম প্রীতি লাভ করেন।

শ্রীলজীব গোস্বামী "ভক্তি সন্দর্ভে" ৩০৩ অনুচ্ছেদে বলেছেন যে, যদি প্রমাদ বশতঃ ভগবৎ চরণে অপরাধ হয় তা হলে ভগবৎ সন্তোষ জনক কার্য করা কর্তব্য। "স্কন্দ পুরাণের" বেরা খণ্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন—

"দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেত্তুলসী স্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষতে তস্য কেশব।।"

অনুবাদঃ— দ্বাদশী হরিবাসরে যিনি জাগরণ পূর্বক তুলসী স্তব পাঠ করেন, ভগবান কেশব তার বত্রিশ প্রকার অবরাধ ক্ষমা করে থাকেন।

অন্যএ বলা হয়েছে যে, তুলসী রোপণ করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রাবণ মাসে তুলসী রোপণ বিশেষ ফলপ্রদ। উক্ত মাসে তুলসী রোপণে ভগবান পুরুষোত্তম সহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন। কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে, তুলসী দ্বারা যিনি শালগ্রাম অর্চন করেন ভগবান কেশব তার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন।

সপ্তম মঞ্জরী

ক) শ্রীতুলসী সেবার বিভিন্ন অঙ্গের মন্ত্র ঃ—

১। দর্শনঃ— "দেবি বিষ্ণুপ্রিয়ে মাতস্তুলসি প্রিয় দর্শনে।
হরিদর্শন দীপার্চ্চিঃ প্রসীদ দ্বিজবল্লভে।।"

২। প্রণামঃ— (ক) "বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।"
(খ) "বিষ্ণুপ্রীতিকরে মাতর্নমস্তে তুলসীশ্বরি।
পবিত্র কুরু মেঽঙ্গানি বিষ্বক্ হর্ষকারিণী।।"

৩। সেবার জন্য প্রার্থনাঃ— নির্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসী হর মেঽবিদ্যাং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে।।"

৪। স্পর্শঃ— "বৈকুণ্ঠেশ্বর পাদাব্জ-বাসিনী প্রিয় দর্শনে।
স্পর্শামি ত্বাং মহাপাপ সঞ্চয়ান্ মে প্রণাশয়।।"

৫। ধ্যানঃ— "শ্যামাঙ্গী তুলসীদেবী দ্বিভুজা মুরতী।
মৃদুহাস্যা শ্বেতবস্ত্রা চারুমুখী সতী।।
হস্তদ্বয়ে শঙ্খপদ্ম সিঁদুর অরুণ।
অলঙ্কারে বিভূষিতা সদা করি ধ্যান।।"

৬। অর্ঘ্যঃ— শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরং সৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তুতে।।

৭। স্নানঃ— ওঁ গোবিন্দ বল্লভাং দেবীং ভক্ত চৈতন্যকারিনীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনীম্।।"

ওঁ তুলস্যৈ ...

৮। পূজাঃ— যথাঃ—এতে গন্ধ পুষ্পে ...
ইদং মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদিকং সর্বং ...
ইদং আচমনীয়ং ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।

৯। মন্ত্র জপঃ— উক্ত ষড়াক্ষর মন্ত্র শতবার জপ কর্তব্য।
অথবা
"লক্ষ্মীবীজ + মায়াবীজ + কামবীজ + বাণীবীজ" যোগে বৃন্দাবন্যৈ স্বাহা।।"
এই মন্ত্ররাজ জপ করা অতি উত্তম।"

১০। নামাষ্টকঃ— "বৃন্দাং বৃন্দাবনীং বিশ্বপাবনীং বিশ্বপূজিতাম্।
পুষ্প সারাং নন্দিনীঞ্চ তুলসীং কৃষ্ণ জীবনীম্।।"

১১। মন্ত্র যোগে নামাষ্টকঃ—
(ক) ওঁ বৃন্দায়ৈ নমঃ।
(খ) ওঁ বৃন্দাবন্যৈ নমঃ।
(গ) ওঁ বিশ্ব পাবন্যৈ নমঃ।
(ঘ) ওঁ বিশ্ব পূজিতায়ৈ নমঃ।
(ঙ) ওঁ পুষ্প সারায়ৈ নমঃ।
(চ) ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ।
(ছ) ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।
(জ) ওঁ কৃষ্ণ জীবন্যৈ নমঃ।

১২। (ক) তুলসী অষ্টকম্ঃ—শঙ্খচূড় উপাখ্যানে দ্রষ্টব্য।

(খ) স্তুতিঃ— মহাপ্রসাদ জননী সর্ব সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী।
আধি ব্যাধি হরা নিত্যং তুলসী ত্বং নমোঽস্তুতে।।"

১৩। পরিক্রমাঃ—

(ক) যানি কাণি চ পাপানি জন্মান্তর শতানি বৈ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণা পদে পদে।।

(খ) যানি কাণি চ পাপনি ব্রহ্ম হত্যাদি কাণি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে।।"

১৪। তুলসীচয়নঃ—

(ক) মাতস্তুলসী কল্যাণী গোবিন্দ চরণ প্রিয়ে।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং প্রসীদ শুভ দর্শনে।।"

(খ) "তুলস্যমৃত জন্মসি সদা ত্বং কেশব প্রিয়া।
কেশবার্থে বিচিন্বামি বরদা ভব শোভনে।।"

১৫। তুলসীর মূলদেশ মার্জ্জনাঃ—

(ক) মাতস্তুলসি কল্যাণী স্থলং তে সুমনোহরম্।
ক্রীড়াস্ত্যাগত্য বিবুধা মার্জ্জয়ে তৎ প্রসীদ মে।।

(খ) তন্মূলে সর্বতীর্থানি তৎপত্রে সর্বদেবতা।
তদঙ্গে সর্ব পুণ্যানি কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িণী।।

কতিপয় শ্লোকের বঙ্গানুবাদ

১। দর্শনঃ—"হে দেবি বিষ্ণুপ্রিয়ে! হে মাতঃ তুলসী! হে প্রিয় দর্শনে। আপনি বিষ্ণু দর্শনে দীপশিখা-সদৃশী! হে দ্বিজ বল্লভে! আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।"

২। প্রণামঃ— (ক) "হে বৃন্দে! হে তুলসী দেবী! হে কেশবপ্রিয়ে! হে বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী দেবী! হে সত্যবতী! আপনাকে নমস্কার করি।"

(খ) "হে বিষ্ণু প্রীতি কারিণী। হে ঈশ্বরী! হে মাতঃ তুলসী! আপনাকে নমস্কার করি। হে বৈষ্ণবের আনন্দদায়িণী! আমার সকল অঙ্গ পবিত্র করুন।"

৩। সেবার জন্য প্রার্থনাঃ— "হে তুলসীদেবী! দেবতাগণ আপনার তত্ত্ব নির্ণয় করেছেন। দেবাসুর আপনার অর্চনা করেন। আপনি আমার অবিদ্যা হরণ করে পূজা গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার।"

৪। স্পর্শঃ— "হে প্রিয়দর্শনে তুলসী! আপনাকে আমি স্পর্শ করছি! আমার সঞ্চিত পাপরাশি বিনাশ করুন।"

৬। অর্ঘ্যঃ— "হে দেবি! আপনি শ্রীর আশ্রয় ও নিবাস ভূমি। আপনি সদাই শ্রীধরের আদরিণী, আমি ভক্তি সহকারে অর্ঘ্য প্রদান করছি, আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। আপনাকে নমস্কার করি।"

৯। স্নানঃ— "হে গোবিন্দ বল্লভে তুলসীদেবী! হে ভক্তের চেতনা সম্পাদন কারিণী! আমি আপনার স্নান সম্পাদন করছি, হে জগন্মাতঃ! আমাকে কৃষ্ণ ভক্তি প্রদান করুন।"

১২। স্তুতিঃ— "হে তুলসী! আপনি প্রভুর প্রসন্নতা-সাধিণী, নিত্য সর্ব প্রকার সৌভাগ্য বর্দ্ধন করেন এবং অবিদ্যা হরণ করে থাকেন, আপনাকে নমস্কার করি।"

১৩। পরিক্রমাঃ— "আমি ব্রহ্মহত্যাদি জনিত যে সকল পাপ করেছি, তৎসমস্তই পরিক্রমা কালে প্রতি পদে পদে নাশ প্রাপ্ত হোক।"

১৪। তুলসী চয়ণঃ— (ক) "হে মাতঃ, তুলসী দেবী! হে কল্যাণী! হে গোবিন্দ চরণ প্রিয়ে! আমি কেশবের জন্য তোমার পত্র চয়ন করছি! হে শুভ দর্শনে! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

(খ) "হে শোভনে! হে তুলসী! অমৃত হতে তোমার উৎপত্তি হয়েছে। তুমি সর্বদাই কেশবের প্রিয়! কেশবের সেবার জন্য আমি তোমার পত্র চয়ন করছি, তুমি বর প্রদায়িনী হও।"

১৫। (ক) "হে কল্যাণী! হে মাতঃ তুলসী! আপনার সুমনোহর অবস্থিতি ক্ষেত্র দেব শ্রেষ্ঠ গণ এসে বিহার করেন। আমি সেই স্থান মার্জ্জনা করছি। আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

(খ) "হে তুলসীদেবী আপনার মূলদেশে সমস্ত তীর্থ নিবাস করেন, পত্রে সমস্ত দেবতা বাস করেন। আপনার অঙ্গে সমস্ত পুণ্যের অবস্থান আপনার মূলদেশ মার্জ্জনা করছি, আপনি কৃষ্ণ ভক্তি প্রদান করুন।

খ) তুলসী চয়নে বিশেষ বিচার ঃ—

শ্রীবিগ্রহ পূজার জন্য তুলসী চয়ন কর্তব্য। স্নান না করে তুলসী চয়ন করতে নেই। তাই স্নান পূর্বক শ্রীতুলসী দেবীকে দন্ডবৎ প্রণাম করে করজোড়ে মন্ত্র- পাঠ পূর্বক ভক্তি ভরে তুলসী চরণে স্বীয় অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করে এক একটি করে পত্র চয়ন করা কর্তব্য। তুলসী পত্র এমন ভাবে চয়ন করতে হবে যেন তুলসী বৃক্ষে কোন রূপ আঘাত না লাগে বা গাছ বেশী না নড়ে। নখ দ্বারা ছেদন করে তুলসী পত্র চয়ন করা উচিৎ নয়। চয়নের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তুলসীর শাখা- প্রশাখা না ভাঙ্গে। চয়নের নিষিদ্ধ সময় বৃক্ষের গলিত পত্র দ্বারা অর্চনাদির কার্য নির্বাহ করা কর্তব্য অথবা নিষিদ্ধ সময়ের পূর্বে চয়ন করে রাখা কর্তব্য। কেননা তুলসী পত্র কখনো বাসী বা পুর্য্যসিত হয় না।

তুলসী পত্র চয়ন সম্পর্কে ব্রহ্মবৈর্বত্ত পুরাণে বলা হয়েছে—

"পূর্ণিমায়ামমায়াঞ্চ দ্বাদশ্যাং রবিসংক্রমে।
তৈলভ্যঙ্গে চ স্নানে চ মধ্যাহ্নে নিশি সন্ধ্যায়োঃ।।
অশৌচেঽশুচিকালে বা রাত্রি বাসোঽন্বিতে নরাঃ।
তুলসীং যে চ বিচিন্বি তে ছিন্দন্তি হরেঃ শিরঃ।।"

ব্র.বৈ.পু.প্রকৃতি খন্ড- ২১/৫১-৫২

অনুবাদঃ— পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, রবিবার, সংক্রান্তী, স্নানের পূর্বে তৈল মেখে, মধ্যাহ্ন কালে, রাত্রি কালে, উভয় সন্ধ্যায়, অশৌচ কালে, অশুচি অবস্থায়, রাত্রি বাসযুক্ত হয়ে, যিনি তুলসী পত্র চয়ন করেন তিনি শ্রী হরির মস্তক ছেদন করে থাকেন।

স্মৃতি শাস্ত্রে সংক্রান্তি, রবিবার, দ্বাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় তুলসী পত্র চয়ন নিষিদ্ধ থাকলেও শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ কেবলমাত্র দ্বাদশী তিথিতেই তুলসী চয়ন করেন না। কেন না দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন করলে পরমায়ূ হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং গর্হিত নরকে নিপতিত হয়।

তুলসী চয়নের প্রার্থনা মন্ত্র স্কন্দ পুরাণে বর্ণির্ত হয়েছে। যথাঃ —

"তুলস্যমৃত জন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে বিচিন্বামি বরদা ভব শোভনে।।
তদঙ্গ সম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মল বিনাশিনী।।

অনুবাদঃ— "হে শোভনে! হে তুলসী! অমৃত হতে তোমার উৎপত্তি হয়েছে, তুমি সর্বদাই জনার্দ্দনের প্রিয়া। কেশবের অর্চনার্থে আমি তোমাকে চয়ন করব, তুমি বরদায়িনী হও। হে পবিত্র কলেবরে! হে কলি কলুষ হারিণী। তদীয় অঙ্গ সমুদ্ভূত পত্র দ্বারা আমি যে প্রকারে জনার্দ্দনের অর্চনা করতে পারি, তুমি তা অনুমোদন কর।"

১৪। তুলসী চয়নঃ—(ক) "হে মাতঃ, তুলসী দেবী! হে কল্যাণী! হে গোবিন্দ চরণ প্রিয়ে! আমি কেশবের জন্য তোমার পত্র চয়ন করছি! হে শুভ দর্শনে! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

(খ) "হে শোভনে! হে তুলসী! অমৃত হতে তোমার উৎপত্তি হয়েছে। তুমি সর্বদাই কেশবের প্রিয়! কেশবের সেবার জন্য আমি তোমার পত্র চয়ন করছি, তুমি বর প্রদায়িণী হও।"

১৫। (ক) "হে কল্যাণী! হে মাতঃ তুলসী! আপনার সুমনোহর অবস্থিতি ক্ষেত্র দেব শ্রেষ্ঠ গণ এসে বিহার করেন। আমি সেই স্থান মার্জ্জনা করছি। আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

(খ) "হে তুলসীদেবী আপনার মূলদেশে সমস্ত তীর্থ নিবাস করেন, পত্রে সমস্ত দেবতা বাস করেন। আপনার অঙ্গে সমস্ত পূণ্যের অবস্থান আপনার মূলদেশ মার্জ্জনা করছি, আপনি কৃষ্ণ ভক্তি প্রদান করুন।

খ) তুলসী চয়নে বিশেষ বিচার ঃ—

শ্রীবিগ্রহ পূজার জন্য তুলসী চয়ন কর্তব্য। স্নান না করে তুলসী চয়ন করতে নেই। তাই স্নান পূর্বক শ্রীতুলসী দেবীকে দন্ডবৎ প্রণাম করে করজোড়ে মন্ত্র- পাঠ পূর্বক ভক্তি ভরে তুলসী চরণে স্বীয় অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করে এক একটি করে পত্র চয়ন করা কর্তব্য। তুলসী পত্র এমন ভাবে চয়ন করতে হবে যেন তুলসী বৃক্ষে কোন রূপ আঘাত না লাগে বা গাছ বেশী না নড়ে। নখ দ্বারা ছেদন করে তুলসী পত্র চয়ন করা উচিৎ নয়। চয়নের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তুলসীর শাখা- প্রশাখা না ভাঙ্গে। চয়নের নিষিদ্ধ সময় বৃক্ষের গলিত পত্র দ্বারা অর্চনাদির কার্য নির্বাহ করা কর্তব্য অথবা নিষিদ্ধ সময়ের পূর্বে চয়ন করে রাখা কর্তব্য। কেননা তুলসী পত্র কখনো বাসী বা পুর্য্যসিত হয় না।

তুলসী পত্র চয়ন সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বলা হয়েছে—

"পূর্ণিমায়ামমায়াঞ্চ দ্বাদশ্যাং রবিসংক্রমে।
তৈলভ্যঙ্গে চ স্নানে চ মধ্যাহ্নে নিশি সন্ধ্যায়োঃ।।
অশৌচেঽশুচিকালে বা রাত্রি বাসোঽন্বিতে নরাঃ।
তুলসীং যে চ বিচিন্ব তে ছিন্দন্তি হরেঃ শিরঃ।।"

ব্র.বৈ.পু. প্রকৃতি খন্ড- ২১/৫১-৫২

অনুবাদঃ— পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, রবিবার, সংক্রান্তী, স্নানের পূর্বে তৈল মেখে, মধ্যাহ্ন কালে, রাত্রি কালে, উভয় সন্ধ্যায়, অশৌচ কালে, অশুচি অবস্থায়, রাত্রি বাসযুক্ত হয়ে, যিনি তুলসী পত্র চয়ন করেন তিনি শ্রী হরির মস্তক ছেদন করে থাকেন।

স্মৃতি শাস্ত্রে সংক্রান্তি, রবিবার, দ্বাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় তুলসী পত্র চয়ন নিষিদ্ধ থাকলেও শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ কেবলমাত্র দ্বাদশী তিথিতেই তুলসী চয়ন করেন না। কেন না দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন করলে পরমায়ূ হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং গর্হিত নরকে নিপতিত হয়।

তুলসী চয়নের প্রার্থনা মন্ত্র স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ —

"তুলস্যমৃত জন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে বিচিন্বামি বরদা ভব শোভনে।।
তদঙ্গ সম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মল বিনাশিনী।।

অনুবাদঃ— "হে শোভনে! হে তুলসী! অমৃত হতে তোমার উৎপত্তি হয়েছে, তুমি সর্বদাই জনার্দ্দনের প্রিয়া। কেশবের অর্চনার্থে আমি তোমাকে চয়ন করব, তুমি বরদায়িনী হও। হে পবিত্র কলেবরে! হে কলি কলুষ হারিণী! তদীয় অঙ্গ সমুদ্ভূত পত্র দ্বারা আমি যে প্রকারে জনার্দ্দনের অর্চনা করতে পারি, তুমি তা অনুমোদন কর।"

গরুড় পুরাণে বলা হয়েছে—

"মৌক্ষৈক হেতো ধরণী প্রশস্তে,
বিষ্ণোঃ সমস্তস্য গুরো প্রিয়েতি।
আরাধনার্থং বরমঞ্জরীকং
লুনামি পত্রং তুলসী ক্ষমস্ব।।"

অনুবাদঃ— হে তুলসী! তুমি একমাত্র মুক্তির কারণ, ধারতলে তৎসদৃশ আর কেহই নেই। তুমি চরাচর গুরু শ্রীহরি প্রিয়া। অতএব তাঁর উপসনার্থে আমি তদীয় সর্বোত্তম মঞ্জরী ও পত্র ছেদন করব, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এই মন্ত্র পাঠ করে প্রণাম পূর্বক দক্ষিণ হস্তে এক একটি পত্র ও মঞ্জরী চয়ন করতঃ উৎকৃষ্ট পাত্রে স্থাপন করা কর্তব্য।

গ) তুলসী আরতি।।

(১)

নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী (নমো নমঃ)।
রাধা কৃষ্ণ সেবা পাব এই অভিলাষী।।
যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছাপূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবন বাসী।
মোর এই অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিওবাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপ রাশি।।
এই নিবেদন ধর সখীর অনুগা কর,
সেবা অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী।
দীন কৃষ্ণ দাসে কয় এইযেন মোর হয়,
শ্রীরাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসি।।

(২)

নমো নমঃ তুলসী মহারাণী বৃন্দে মহারাণী (নমো নমঃ)।
নমোরে নমোরে ম্যাইয়া নমো নারায়ণী।।
যাঁকো দরশে পরশে অঘনাশই,
মহিমা বেদ পুরাণে বাখানি।
যাঁকো পত্র মঞ্জরী কোমল,
শ্রীপতি- চরণ- কমলে লপটানী।।
ধন্য তুলসী পূরণ তপ কিয়ে,
শ্রীশাল গ্রাম- মহা পাটরাণী।
ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আরতি,
ফুলনা কিয়ে বরখা বরখানি।।
ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন,
বিনা তুলসী প্রভু একোনাহি মানি।
চন্দ্রশেখর ম্যাইয়া তেরা যশ গাওয়ে
ভক্তি দান দীজিয়ে মহারাণী।।
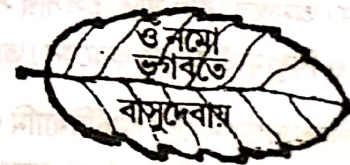
অষ্টম মঞ্জরী

ক) শ্রীতুলসী দেবীর বিবাহ (স্কন্দ পুরাণ) ঃ—

শ্রীমতী তুলসী দেবীর বিবাহ সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে বর্ণনা করা হয়েছে। কার্ত্তিক মাসে শুক্লা নবমীতে শ্রীকৃষ্ণ স্ববেদোক্ত বিধানে তুলসী দেবীর কর পীড়ন করেন। অতএব, যে মানব এই নবমী দিনে শ্রীকৃষ্ণের উৎসব করেন, তার কন্যা দানের ফললাভ হয়। জিতেন্দ্রিয় মানব কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে সুবর্ণ দ্বারা তুলসীর সহিত বিষ্ণুর সুশোভন মূর্তি নির্মাণ পূর্বক বিধিবৎ পূজা করবেন এবং তিন দিন ব্রতস্থ হয়ে যথাবিধি বিষ্ণু ও তুলসীর বৈবাহিক বিধি সম্পন্ন করবেন। এই ত্রিরাত্র বৈবাহিক বিধিতে নবম্যাদির অনুরোধে পূর্ব বিদ্ধা মধ্যাহ্ন ব্যাপিনী নবমীরই গ্রহণ জানবেন। অত্র অনুষ্ঠানে ইচ্ছুক ব্যক্তি বৈষ্ণবগণ দ্বারা প্রতিবর্ষেই সায়ং কালে অবশ্যই যথাবিধি তুলসীর বিবাহ বিধি সম্পাদন করবেন।

তুলসীর বিবাহ বিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, এক পল সুবর্ণ দ্বারা বিষ্ণুর সুশোভন মূর্তি নির্মাণ করবেন। শক্তি অনুসারে তদর্দ্ধ- অর্দ্ধপল বা এক পলের চতুরংশ দ্বারাও নির্মাণ করতে পারেন। অনন্তর বিষ্ণুমূর্তি ও তুলসীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে স্তব দ্বারা বিষ্ণুমূর্তি উত্থাপিত করবেন। পুরুষ সূক্ত মন্ত্রে ষোড়শ উপচারে পূজা করবেন। পূজার পূর্বে পুণ্যাহ বাচন, নান্দী শ্রদ্ধাদি করা কর্তব্য। দেববাদ্যাদির ধ্বনি করতে করতে সেই বিষ্ণুমূর্তি আনয়ন করবেন। অনন্তর বিষ্ণু মূর্তি তুলসীর সমীপে স্থাপন পূর্বক মধ্যে একখানি বস্ত্র দ্বারা তুলসী ও বিষ্ণুমূর্তি আবৃত্ত করবেন। তারপর —

"আগচ্ছ ভগবান দেব অর্চ্চয়িষ্যামি কেশব।
তুভ্যং দাস্যামি তুলসীং সর্বকাম প্রদো ভব।।"

এই প্রার্থনা বাক্যে ভগবানের আবাহন করে তিনবার পাদ্যাদির নাম উল্লেখ পূর্বক পাদ্য, অর্ঘ্য আসন ও আচমনীয় প্রদান করবেন। একটি কাংস্য পাত্রে মিলিত দধি ঘৃত ওদুগ্ধ রেখে অপর একটি কাংস্য পাত্র দ্বারা তা আচ্ছাদন পূর্বক বলবেন—

"মধুপর্কং গৃহাণ বাসুদেব নমোঽস্তু তে।"

হে বাসুদেব! আপনি মধুপর্ক গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার। অনন্তর হরিদ্রা লেপনাদি বিষ্ণুর অভ্যঙ্গকার্য্য সমাধান করে গোধূলি কালে পুনরায় তুলসী ও কশবের পৃথক পৃথক পূজা করে সম্মুখে মঙ্গলাবহ স্তুতিপাঠ পূর্বক তাদের প্রসন্ন করবেন।

অনন্তর আকাশে যখন সূর্যদেব ঈষৎ দৃষ্ট হবেন তখন সংকল্প করে স্বীয় গোত্র প্রবর ও তিন পুরুষের নাম উচ্চারণ পূর্বক প্রার্থনা করবেন।—

"অনাদি মধ্য নিধন ত্রৈলোক্য প্রতিপালক।
ইমাং গৃহাণ তুলসীং বিবাহ বিধিনেশ্বর।।
পার্ব্বতী বীজ সম্ভূতাং বৃন্দাভস্মনি সংস্থিতাম্।
অনাদি মধ্য নিধনাং বল্লভান্তে দদাম্যহম্।।
পয়োঘটেশ্চ সেবাভিঃ কন্যাবদ্বর্দ্ধিতা ময়া।
তৎপ্রিয়াং তুলসীং তুভ্যং দদামি ত্বং গৃহাণ ভোঃ।।

এই প্রার্থনা বাক্যে বিষ্ণুকে তুলসী প্রদান করে তারপরে তাঁদের পূজা করত বিবাহ উৎসবে রাত্রি জাগরণ করবেন। অনন্তর প্রভাতে বিষ্ণু ও তুলসীর পূজা করে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে বহ্নি স্থাপন পূর্বক পায়স, ঘৃত, মধু ও তিল দ্বারা অষ্টোত্তর শত আহুতি প্রদান করবেন। তারপর স্বিষ্টিকৃৎ হোম করে পূর্ণাহুতি প্রদান করবেন। পূর্ণাহুতি প্রদানান্তে আচার্যকে অর্চনা করে হোম শেষ করবেন। দ্বিজগণের মুখের বাক্যে ব্রতের কোন অংশ অসম্পূর্ণ থাকলে তা সম্পূর্ণ করে নিবেন। তারপর জনার্দ্দনের নিকট প্রার্থনা করবেন।

"ইদং ব্রতং ময়াদেব কৃতং প্রীতৈ তব প্রভো।
ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতু তৎ প্রসাদাজ্জনার্দ্দন।।"

অর্থাৎ- হে জনার্দ্দন! আপনার প্রীতির জন্য আমি এই ব্রত করেছি, যদি কোন অঙ্গ অপূর্ণ থাকে তা আপনার কৃপা [illegible]

নিয়মসেবা বা কার্ত্তিক ব্রত করলে দ্বাদশীতে পারণ করা কর্তব্য। তারপর সন্ধ্যাকালে মনোজ্ঞ ইক্ষুদণ্ড দ্বারা তুলসী ও বাসুদেবকে পূজা করবেন। অনন্তর ধনাদি দান করে শ্রীহরির বিসর্জন করবেন এবং শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা করবেন।—

"বৈকুণ্ঠং গচ্ছ ভগবংস্তুলসী সহিতং প্রভো।
মৎকৃতং পূজনং গৃহ্য সন্তুষ্টো ভব সর্বদা।।
গচ্ছ গচ্ছ সুরশ্রেষ্ঠ স্বস্থানে পরমেশ্বর।"

অনুবাদঃ— হে প্রভো! হে ভাগবান! তুলসীর সহিত আপনি বৈকুণ্ঠে গমন করুন এবং আমার পূজা গ্রহণ করে আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! হে পরমেশ্বর! আপনি স্বস্থানে গমন করুন, গমন করুন। এরূপে বিষ্ণু বিগ্রহ বিসর্জন করবেন। বিষ্ণু বিগ্রহাদি সকল দ্রব্যই আচার্যকে অর্পণ করবেন। এরূপ অনুষ্ঠান করলে মানব পরম মঙ্গল লাভ করেন।

খ) শ্রীতুলসী দেবীর বিবাহ (শ্রীহরিভক্তি বিলাস)

স্মৃতি গ্রন্থরাজ শ্রীহরিভক্তি বিলাসের বিংশবিলাসে শ্রীমতী তুলসী দেবীর বিবাহ ও প্রতিষ্ঠা বিধি পঞ্চরাত্র বিধি অনুসারে বর্ণনা করা হয়েছে। বনে বা গৃহে তুলসী রোপণ পূর্বক তিন বর্ষ পরে তার অর্চনা আরম্ভ করবেন। উত্তরায়ণে, বৃহস্পতি-শুক্রের উদয়ে কিংবা কার্ত্তিক মাসে ভীষ্ম পঞ্চক দিবসে বিবাহোচিত নক্ষত্রে পূর্ণিমা তিথিতে মণ্ডপ প্রস্তুত করতঃ তাতে কুণ্ড ও বেদী রচনা করে শান্তি বিধান করতে হয়। তৎপরে বিবাহবৎ মাতৃগণের স্থাপন ও মাতৃ শ্রদ্ধাদি করতে হয়। বেদ- বেদাঙ্গদর্শী স্নাতক ও পবিত্র একজন দ্বিজাতিকে ব্রহ্মা বা আচার্যরূপে এবং আরও চার জনকে ঋত্বিক রূপে বরণ করতে হয়। বৈষ্ণব বিধি অনুসারে বর্দ্ধনী কলসীর অর্চনা পূর্বক তথায় মণ্ডপ প্রস্তুত করে মনোহর লক্ষ্মী- নারায়ণ মূর্তি স্থাপন করতে হয়। তৎপরে যজ্ঞগৃহ মাতৃগণের অর্চনা ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করে স্বর্ণময়ী হরিমূর্তি স্থাপন করতে হয়। রজতময়ী তুলসী নির্মাণ পূর্বক সন্ধ্যালগ্নে- "বাসঃশতম্"- মন্ত্রে বস্ত্রদ্বয় দ্বারা বেষ্টন করতে হয়। তারপর "যদাবধণ"- মন্ত্রে কর পল্লবে কঙ্কণ বন্ধন পূর্বক "কোঁহদাৎ"- মন্ত্রে পাণি গ্রহণ সম্পাদন করতে হয়। প্রমাণ যথা—

"বামঃশতেন মন্ত্রেন বস্ত্র যুগ্মেন বেষ্টয়েৎ।
যদাবধ্নে তি মন্ত্রেন কঙ্কণং পাণি পল্লবে।
কোঽদাদিতি চ মন্ত্রেন কর গ্রাহো বিধিয়তে।।"

তারপরে আচার্য্য ঋত্বিকগণের সাথে মিলিত হয়ে বেদিকা কুণ্ডে নয়টি আহুতি প্রদান করবেন। গুরু প্রবর বিবাহ ক্রিয়াবৎ সমস্ত বৈষ্ণব কর্ম সমাপন পূর্বক বিধানে।—

"ওঁনমো ভগবতে কেশবায় নমঃ স্বাহা।
নারায়ণায় স্বাহা।

মাধবায় গোবিন্দায় বিষ্ণবে মধুসূদনায় ত্রিবিক্রমার বামনায় শ্রীধরায় হৃষীকেশায় পদ্মনাভায় দামোদরায় উপেন্দ্রায় প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় অচ্যুতায় অনন্তায় গদিনে চক্রিনে বিশ্বকসেনায় বৈকুণ্ঠায় জনার্দ্দনায় মুকুন্দায় অধোক্ষজায় স্বাহা। ইতি হোমঃ।— এই মন্ত্রে হোম করবেন। তারপর যজমান, তদীয় সহধর্মিণী ও অন্যান্য গোত্র বান্ধবগণ বিষ্ণু সমভিব্যাহারে চারিবার তুলসীকে প্রদক্ষিণ করবেন। পরে তুলসী বিবাহ বিষয়ক শতকুম্ভ সূক্ত পাবমানী সূক্ত, শান্তি কবধ্যায় নবসূক্ত, জীবসূক্ত ও বৈষ্ণব সংহিতা জপ করবেন। তারপর রমণীগণ শঙ্খ, ঝল্লরী, ভেরী, তূর্য্য, প্রভৃতির শব্দ সহকারে মঙ্গল গান করে বিধানে মঙ্গলাচারণ করবেন। তৎপরে পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্বক অভিষেক বিধি সমাপনান্তে ব্রহ্মাকে বৃষ, আচার্যকে গো ও শয্যা এবং ঋত্বিক গণকে বস্ত্র দিয়ে সকলকেই দক্ষিণা প্রদান করবেন। এই প্রকারে তুলসী দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে বিষ্ণুসহ তাঁর পূজা করতে হয়। এই প্রকার তুলসীর বিবাহ অনুষ্ঠান দর্শন করলে আজন্ম সঞ্চিত পাতকাদি দূরীভূত হয় এবং পরম মঙ্গল লাভ হয়।

(বিঃ দ্রঃ — শ্রীমতী তুলসী দেবীর বিবাহ অনুষ্ঠানে আগ্রহী ভক্ত অভিজ্ঞ বৈষ্ণবাচার্যের শরণাপন্ন হয়ে তার নির্দেশানুসারে তুলসী বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদন করবেন)

।। শ্রীতুলসী খন্ড সমাপ্ত।।

গ্রন্থ সমাপ্তি কাল,

মাঘী পূর্ণিমা — ৫১৯ গৌরাব্দ।
"গোবিন্দ প্রিয়া তুলসী ভক্তি প্রদায়িণী।
অহৈতুকী সেবা দাও মহাপাটরাণী।।
পতিত জনের কর বাঞ্ছিত পূরণে।
মোর অভিলাষ সদা রাখ শ্রীচরণে।।" —

শ্রীশ্রীবৃন্দা-তুলসীর মহিমা বিভিন্ন শাস্ত্রে সুদীর্ঘকাল ব্যাপী বৈষ্ণব সাধকগণের অন্তরে আরাধ্যের সেবোৎকণ্ঠা জাগিয়ে তাঁদের ধন্য করেছেন এবং অনাগত কাল পর্যন্ত ধন্য করবেন। শাস্ত্রীয় চিন্তা- ভাবনা এতই উচ্চ আদর্শে গঠিত যে, সেখানে আমার ন্যায় জীবাধমের গমনোপায় নেই। অতএব, শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত নির্বাচনে মাদৃশ্য অযোগ্য ও ভজনহীনের কোন অধিকারই নেই, তথাপিও ভক্তগণের কৃপাদেশ শিরোধার্য করে এবং স্বীয় দুষ্ট কলুষিত চেতনাকে শোধন করার জন্য যথামতি আলোচনা করলাম। এতে শাস্ত্রীয় গুরু গম্ভীর ভাবকে যে তরলিত করা হলো, সে জন্য আমার আরাধ্যগণ এ অধমের অপরাধ মার্জনা করুন।

জয় শ্রীশ্রীগুরু- গৌরাঙ্গ।
জয় শ্রীশ্রীবৃন্দা- তুলসী.মহারাণী।
।। গ্রন্থ সমাপ্ত।।